ফিলিস্তিন

বেঁচে থাকার লড়াই

বই	**ফিলিস্তিন : বেঁচে থাকার লড়াই**
লেখক	ড. রাগিব সারজানি
ভাষান্তর	মানসূর আহমাদ, মাহদি হাসান
বানান সমন্বয়	মুহাম্মদ পাবলিকেশন প্রুফরিডিং টিম
প্রকাশক	মুহাম্মদ আবদুল্লাহ খান
প্রচ্ছদ	আবুল ফাতাহ মুন্না
অঙ্গসজ্জা	মুহাম্মদ পাবলিকেশন গ্রাফিক্স টিম

পরিমার্জিত বর্ধিত সংস্করণ

ফিলিস্তিন

বেঁচে থাকার লড়াই

ড. রাগিব সারজানি

মুহাম্মদ পাবলিকেশন

অর্পণ

ফিলিস্তিনের মুক্তি কামনায়...

প্রকাশকের কথা

ফিলিস্তিন। একটি আহত, ক্ষতবিক্ষত দেহ। লাখো শ্বাপদের দল যে শরীর খুবলে নিয়েছে তাদের হিংস্র নখর দিয়ে।

জেরুসালেম। এক কালের সুন্দর সুশোভিত একটি নগরী। প্রাচীন এই শহর উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাসনামলে মুসলিমরা জয় করে। ক্রমেই বিজিত হয় পুরো ফিলিস্তিন। বহুকাল পরে ক্রুসেডারদের দ্বারা আক্রান্ত হয় এই ফিলিস্তিন। হিংস্র হায়েনার দল বুক-সমান রক্তের বন্যা বইয়ে দিয়ে প্রবেশ করে পবিত্র শহর জেরুসালেমে। সে যাত্রায় সালাহুদ্দিন আইয়ুবি রাহিমাহুল্লাহ শহরটাকে মুক্ত করেন।

অনেকদিন পর শহরটা আবারও ক্রুসেডারদের দখলে চলে যায়। তখন মুক্ত করেন নাজমুদ্দিন আইয়ুব রাহিমাহুল্লাহ। আবারও ফিলিস্তিন চলে যায় কুখ্যাত রক্তখেকোর দল মঙ্গোল বাহিনীর দখলে। তাদের কালো থাবা থেকে ফিলিস্তিনকে মুক্ত করেন সাইফুদ্দিন কুতুজ ও রুকনুদ্দিন বাইবার্স রাহিমাহুমাল্লাহ।

ফিলিস্তিন আজও ক্রুসেডার খ্রিষ্টানদের হাত ধরে জায়নবাদী ইহুদি কুকুরদের দখলে। ফিলিস্তিন আজও একজন সালাহুদ্দিনের জন্য ডুকরে কাঁদে। ফিলিস্তিন আজও একজন বাইবার্সের অপেক্ষায় দিন কাটায়। ফিলিস্তিনের মুক্তির জন্য আমাদের অনেক কিছুই করার আছে। সেই

করণীয়গুলো বলবে মিসরের প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ ড. রাগিব সারজানির এ বই।

একুশে বইমেলা ২০২০ এ প্রকাশিত এ বইটি অনুবাদ করেছেন নবীন আলিম মানসূর আহমাদ। কিন্তু বইটি বাজারে আসার পর থেকে বইটির ব্যাপক পাঠকপ্রিয়তা এবং বর্ধিত কলেবরের বিষয়ে পাঠকের তীব্র আগ্রহে এ পর্যায়ে আমরা একই বিষয়ে লেখকের অন্য আরেকটি গ্রন্থের কিছু বিষয় এ বইয়ে সংযোজন করেছি। আশা করি এখন বইটি আরও পূর্ণতা ও পাঠকপ্রিয়তা পাবে। এ অংশের অনুবাদ করেছেন মাহদি হাসান। আল্লাহ উভয়কেই জাযায়ে খায়ের দান করুন।

প্রিয় পাঠক, বইটি সাবলীল ও নির্ভুল করতে কোনোরূপ চেষ্টায় ত্রুটি করা হয়নি। তারপরও কোনো অসংগতি বা কোনো ভুল দৃষ্টিগোচর হলে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি ও সংশোধনের মনোভাব নিয়ে অবহিত করবেন বলে আশা রাখি।

পরিশেষে আল্লাহ তাআলা বইটির সাথে সংশ্লিষ্ট সবাইকে জাযায়ে খায়ের দান করুন। বইটির যা কিছু ভালো, তার সবই আল্লাহর পক্ষ থেকে। আর যা কিছু অসুন্দর তার সবই আমাদের সীমাবদ্ধতার কারণে। আল্লাহ উত্তম কর্মবিধায়ক।

—মুহাম্মদ আবদুল্লাহ খান
২০ সেপ্টেম্বর, ২০২০ খ্রি.

লেখকের কথা

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

আনদালুসে মুসলিমদের সর্বশেষ দুর্গ গ্রানাডা অঞ্চলে সংঘটিত প্রতিরোধ আন্দোলন ব্যর্থ হয়ে যাওয়ার পর, ৮৯৭ হিজরির ২রা রবিউল আওয়াল মোতাবেক ১৪৯২ খ্রিষ্টাব্দের ২রা জানুয়ারি তারিখে মুসলিম আনদালুসের সর্বশেষ শাসক আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ আস-সগির আত্মসমর্পণের চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। আবু আবদুল্লাহ সগির গ্রানাডা শহর থেকে বেরিয়ে গ্রানাডার রাজপ্রাসাদ আল-হামরা'র পাশের এক টিলায় এসে দাঁড়ান। এ সময় তিনি কাঁদছিলেন, বিলাপ করছিলেন। তখন তাঁর মা আইশা আল-হুররাহ তাঁকে বলেন, 'হ্যাঁ, শাসক হিসেবে পুরুষের মতো যদি প্রতিরোধ করতে না পারো, তবে তুমি মহিলাদের মতোই কাঁদো!' এরই মধ্য দিয়ে আটশ বছর ইসলামি শাসনের পর মুসলিমরা আনদালুস থেকে চিরতরে বিতাড়িত হয়। কালের স্রোত অনেক অপ্রত্যাশিত বিষয় নিয়ে আসে। যে দেশটাতে এত দীর্ঘদিন ইসলামি শাসন কায়েম ছিল, আজ সেখানে মাত্র প্রায় এক লাখ মুসলিম বসবাস করে। মুসলিমদের সংখ্যার বিচারে এটি বর্তমানে বিশ্বের সবচেয়ে কমসংখ্যক মুসলিমদের দেশগুলোর একটি। এটা এমন এক শিক্ষা, যা প্রতিটি মুসলমানের জন্য বোঝা আবশ্যক।

আমি সম্ভবত পাঠকদের চেহারায় একটা অবাক বিস্ময় লক্ষ করছি! এখানে আনদালুসের কাহিনি কেন উল্লেখ করা হচ্ছে? এ বইটি কি 'ফিলিস্তিনে'র সাথে নির্দিষ্ট নয়? হ্যাঁ, এখানে ফিলিস্তিন নিয়েই আমাদের আলোচনা চলছে। তবে বর্তমানের ফিলিস্তিন আর অতীতের আনদালুসের মাঝে অত্যন্ত জোরালো সম্পর্ক রয়েছে। সুবহানাল্লাহ! সময়ের দূরত্ব এবং স্থানের

দূরত্ব সত্ত্বেও আনদালুস ও ফিলিস্তিনের মাঝে দৃঢ় সম্পর্ক রয়েছে। এই পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে আমরা হয়তো বিষয়টা বুঝতে পারব। এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এক বিষয়।

সামান্য-কিছু স্মৃতিচিহ্ন ও গির্জায় পরিবর্তিত হয়ে যাওয়া কয়েকটি মসজিদ ছাড়া আনদালুসে ইসলামের আর কোনো নিদর্শন নেই কেন? অথচ আনদালুস ছাড়াও অনেক ইসলামি রাষ্ট্র ও শহর কাফেরদের দখলের শিকার হয়েছে। তবু সেসব রাষ্ট্র থেকে তো ইসলাম বিতাড়িত হয়নি! মিসর, আলজেরিয়া, সিরিয়া, সুদান, লিবিয়া, ইরাক এবং মুসলিম বিশ্বের বেশিরভাগ রাষ্ট্র দখলদারির শিকার হয়েছে। তবে দীর্ঘদিনের দখলদারি সত্ত্বেও এসব রাষ্ট্র এখনও মুসলিম রাষ্ট্র হিসেবে টিকে আছে। কিন্তু স্পেন ও পর্তুগাল তথা আনদালুসের অবস্থা ভিন্ন। কেন? কারণ, আনদালুসের ইসলামি রাজ্যগুলোকে স্পেনিশদের দখল করাটা ছিল বসতি স্থাপন করা এবং গ্রাস করে নেওয়ার দখল। অর্থাৎ, স্পেনিশরা যে ইসলামি শহরেই প্রবেশ করত, সে শহরের সকল অধিবাসীকে শেষ করে দিত; তাদেরকে সর্বত্র সমষ্টিগতভাবে হত্যা করত কিংবা শহর থেকে বিতাড়িত করে দিত। এভাবে সময় অতিক্রান্ত হলো, আর শহরের মুসলিম অধিবাসীরা হয় শহিদ হয়ে গেল, আর না হয় শরণার্থীতে পরিণত হয়ে গেল! অতঃপর এই রাজ্যে বসবাস করতে সব জায়গা থেকে স্পেনিশরা চলে এলো। এভাবে সময় অতিক্রান্ত হলো, আর আনদালুসের সকল অধিবাসী হয়ে গেল স্পেনিশ! তারা মুসলিম নয়। মুসলিমরা আনদালুস থেকে একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল!

দেখুন তো সে সময় আনদালুসের আশপাশের রাষ্ট্রসমূহ তথা তিউনিসিয়া, আলজেরিয়া, মরক্কো, মিসর ও সিরিয়ার মুসলিমদের অবস্থা কেমন ছিল? আনদালুসের পতনের সময় কেমন ছিল মুসলিমদের অবস্থা? মুসলিমরা ছিল প্রচণ্ড বিভেদ ও দুর্বলতায় আক্রান্ত। তবুও, এই দুর্বলতা সত্ত্বেও নিঃসন্দেহে তারা আনদালুস ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে চিন্তাভাবনা করেছিল। কিন্তু কৌশলের স্বল্পতার কারণে তারা তা ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়নি। এটাও নিশ্চিত যে, যেসব মুসলিম আনদালুসের পতনের সময় সেখান থেকে বিতাড়িত হয়েছিল, তারাও একদিন সেখানে ফিরে যাওয়ার ব্যাপারে ভেবেছিল। কিন্তু তাদের অক্ষমতা ও সামর্থ্যের দুর্বলতার কারণে তারা আর ফিরে আসতে পারেনি। এক মাস, দুই মাস, এক বছর, দুই বছর করে করে এভাবেই কেটে গেল পাঁচশ বছর! মুসলিমদের স্মৃতি থেকে হারিয়ে গেল আনদালুস (স্পেন ও পর্তুগাল)। এখনকার মুসলিমদের মাঝে কজন আনদালুসকে ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে ভাবে? একজনও না। এখন তো

আনদালুস হচ্ছে এমন দুই রাষ্ট্রের নাম, যেগুলো প্রতিটা মুসলিম দেশের সাথে 'বন্ধুত্বপূর্ণ' সম্পর্ক রাখে!

পূর্ববর্তী ঐতিহাসিকরা আনদালুসের পতনের পর যখন তা নিয়ে আলোচনা করতেন, তখন বলতেন, 'আল্লাহ যেন আনদালুসকে আবারও মুসলিমদের মাঝে ফিরিয়ে দেন।' উদাহরণত কোনো ইতিহাসবিদ আনদালুস সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলতেন, '৯২ হিজরি সনে তারিক বিন জিয়াদ রাহিমাহুল্লাহ আনদালুস বিজয় করেন। আল্লাহ যেন তা আবারও মুসলিমদের মাঝে ফিরিয়ে দেন।' এর কারণ হচ্ছে, তখনও মুসলিমদের স্মৃতিতে, আলোচনায় আনদালুস ছিল। কিন্তু কালের পরিক্রমায় 'আল্লাহ যেন আনদালুসকে আবারও মুসলিমদের মাঝে ফিরিয়ে দেন' কথাটা হারিয়ে গেল, ইতিহাসবিদদের মুখ থেকে মিলিয়ে গেল!

গতকালের সাথে আজকের কী মিল! (অতীতের সাথে বর্তমানের কত সাদৃশ্য!) আনদালুস নতুন করে পুনরাবৃত্ত হচ্ছে! কোথায়? ফিলিস্তিনে! হ্যাঁ, ফিলিস্তিনে! হুবহু স্পেনিশদের দখলদারির পদ্ধতিতে—মুসলিমদের হত্যা কিংবা বিতাড়িত করা, জনগণকে শরণার্থী ও শহিদে পরিণত করে দেওয়া, ভবন ও বাড়িঘর বিধ্বস্ত করে দেওয়া এবং সব জায়গায় ইহুদিদের বসতি স্থাপন; ফিলিস্তিনি জনগণের জায়গায় ইহুদি জাতিকে নিয়মতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠিতকরণ। বিষয়টাকে যদি এভাবেই চলতে দেওয়া হয়, মুসলিমদের পশ্চাদপসরণ ও সহনশীলতার মধ্যেই ছেড়ে দেওয়া হয়, তবে পরিণতি একইরকম হবে। ফিলিস্তিন হুবহু আনদালুসের পরিণতি বরণ করবে। বসতি স্থাপন ও ইহুদিদেরকে প্রতিষ্ঠিতকরণের কাজ এভাবে চলতে থাকলে কালের পরিক্রমায় পুরো দেশটার নাম হয়ে যাবে ইসরায়েল, যেভাবে কালের পরিক্রমায় আনদালুসের নাম হয়ে গেছে স্পেন ও পর্তুগাল। দখলদারির মধ্য দিয়ে অনেক দিন অতিবাহিত হয়ে গেলে এটা বাস্তব বিষয়ে পরিণত হবে।

উদাহরণত ত্রিশ বছর পর্যন্ত মুসলিমরা ইহুদিদের অস্তিত্বকেই স্বীকার করেনি, মেনে নেয়নি। বরং তারা ইহুদিদেরকে এভাবে বিশেষায়িত করেছে যে, 'এরা হলো চোরের দল। এরা কিছু ভূমির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে, যেগুলো এদের ভূমি নয়। এরা এই ভূমি কেড়ে নিয়েছে এবং এখানে বসতি স্থাপন করেছে।' অতঃপর আরও কিছুদিন অতিবাহিত হওয়ার পর আরবের

পূর্ববর্তী অস্বীকারকারীরাই দখলকৃত ভূমির ৭৮%-এর ওপর ইসরায়েলের অস্তিত্ব স্বীকার করে নিলো! এটা হচ্ছে পশ্চিম তীর ও গাজা ব্যতীত ফিলিস্তিনের সম্পূর্ণ ভূমি। অতঃপর মূল দখলদারির ৭৮% ছাড়াও একসময় তারা পশ্চিম তীর এবং গাজারও ৬০% ভূমির ওপর ইসরায়েলের দখলদারি মেনে নেবে। এটা হবে পশ্চিম তীর ও গাজার অভ্যন্তরে ইহুদিদের বসতির পরিমাণ ও আকার-আকৃতি অনুসারে।

এরপর এমন একটা নতুন ধাপ আসবে, যখন ইহুদিরা অবশ্যই ফিলিস্তিনিদের অস্তিত্বকে একেবারে বিলীন করে দেওয়ার চেষ্টা করবে। সে সময় এক দিন, দুই দিন, এক বছর, দুই বছর, এক যুগ বা দুই যুগ পর্যন্ত মুসলিমরা চিৎকার করবে, ফরিয়াদ করবে। সময় বয়ে চলবে। পুরো ফিলিস্তিন ইসরায়েলে পরিণত হবে। এরপর মুসলিমরা ইসরায়েলের সাথে তেমন সম্পর্কই রাখবে, যেমনটা এখন স্পেন ও পর্তুগালের সাথে রাখে। ফিলিস্তিনের ওপর এই দখলদারি চলতে থাকলে একটা সময় আসবে, যখন মুসলিমরা ইসরায়েলের পর্যটন মন্ত্রণালয়ের ভিসা নিয়ে মসজিদে আকসায় ভ্রমণে যাবে! যেভাবে এখন স্পেনের পর্যটন মন্ত্রণালয়ের ভিসা নিয়ে কর্ডোভার মসজিদ ভ্রমণে যায়!

ফিলিস্তিনের সমস্যাটা মুসলিম উম্মাহর অত্যন্ত গুরুতর একটা সমস্যা। এমনকি সম্ভবত সবচেয়ে সংকটপূর্ণ একটা সমস্যা। ফিলিস্তিনের ব্যাপারটা এমন এক জাতির ব্যাপার, যাদেরকে হত্যা করা হবে; এমন এক জনগণের ব্যাপার, যাদেরকে নির্মূল করা হবে; এমন এক ভূমির ব্যাপার, যা ছিনিয়ে নেওয়া হবে; এমন কিছু নারীর ব্যাপার, যাদেরকে ধর্ষণ করা হবে; এমন কিছু সম্মানের ব্যাপার, যাকে লাঞ্ছিত-অপমানিত করা হবে; এমন এক ধর্মের ব্যাপার; যাকে ধ্বংস করা হবে!

আসুন, দেখি, ফিলিস্তিন যেন আরেকটা আনদালুসে পরিণত না হয়, সেজন্য আমরা এক জাতি হিসেবে এবং একেক ব্যক্তি হিসেবে কী করতে পারি।

এই বইয়ে আমি কোনো সরকার কিংবা সরকারি প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনকে সম্বোধন করছি না।

আমি এ ব্যাপারে আত্মসম্মানবোধ-সম্পন্ন সকল মুসলিমকে সম্বোধন করছি।

আমি সম্বোধন করছি ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, আইনজীবী ও শ্রমিকদেরকে।

সম্বোধন করছি মিস্ত্রি, কামার, শ্রমিক ও কৃষকদেরকে।

সম্বোধন করছি বিদ্যালয়ের শিক্ষক-ছাত্রদের।

আমি সম্বোধন করছি আলিমদেরকে, তেমনিভাবে সম্বোধন করছি একেবারে সাধারণ লোকজনকে, যারা লেখাপড়া জানে না ঠিক, কিন্তু ফিলিস্তিনের জন্য ব্যথা অনুভব করে।

প্রিয় মুসলিম ভাইয়েরা, আমি এ গ্রন্থে সাধারণ মুসলিমদেরকে সম্বোধন করছি, যাদের হাতে বাহিনী পরিচালনা, সম্পর্ক ছিন্ন করা, দূতাবাস বন্ধ করে দেওয়া, ইহুদিদের স্বাভাবিকতাকে থামিয়ে দেওয়া, এরিয়েল শ্যারনের বিচার করা এবং মুসলিম নেতৃবৃন্দকে ঐক্যবদ্ধ করার সক্ষমতা-সামর্থ্য নেই।

মহান আল্লাহ বলেন, 'আল্লাহ কোনো ব্যক্তিকে তার সামর্থ্যের বাইরে দায়িত্ব দেন না।' [সুরা বাকারাহ : ২৮৬]

এ বইয়ে আমরা এই সামর্থ্যের ওপর আমাদের হাত রাখার চেষ্টা করব।

আমি আপনার কাছ থেকে ছয়টা কাজ, ছয়টা কর্তব্যপালন চাচ্ছি। যদি আপনি এগুলো ভালোভাবে পালন করেন, তবে আপনি 'ফিলিস্তিনের হক আদায়কারী' লোকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবেন; আপনি হয়ে যাবেন ফিলিস্তিনের মুক্তিতে অবদান রাখা এক ব্যক্তি; আপনি হয়ে যাবেন নিজ শক্তি-সামর্থ্যকে কাজে লাগানো এক ব্যক্তি। কিয়ামতের দিন আপনি বলবেন, হে আমার রব! আমি ফিলিস্তিনের জন্য ব্যথিত হয়েছি; আমি এই এই কাজ করেছি। আমার এগুলো করারই সামর্থ্য ছিল।

তবে এ বইয়ে আমি ফিলিস্তিনে বসবাসরত মুজাহিদ ভাইদেরকে সম্বোধন করছি না। কারণ, তাঁরা এমন এক কর্তব্য পালন করছে, যা এই সবগুলো কর্তব্যকে ছাড়িয়ে যাবে। আর সেই কর্তব্য হচ্ছে জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ তথা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ ও সংগ্রাম। কেননা, ইহুদিদের বিরুদ্ধে জিহাদের সমকক্ষ কোনো কাজ হতে পারে না। আমরা আল্লাহর কাছে মুজাহিদ ভাইদের দৃঢ়তা ও আন্তরিকতা প্রার্থনা করছি।

প্রথম কর্তব্য: ফিলিস্তিন ইস্যুটাকে সঠিকভাবে বোঝা এবং এ ব্যাপারে মানুষের মাঝে দ্রুত চেতনা ও জাগরণ সৃষ্টি করা।

দ্বিতীয় কর্তব্য: মানসিক পরাজয়ের অবসান ঘটানো এবং মুসলিম উম্মাহর জাগরণ ফিরিয়ে আনতে আশার সঞ্চার করা।

তৃতীয় কর্তব্য: সাধ্য অনুযায়ী (ফিলিস্তিনের জন্য) অর্থ-কড়ি ব্যয় করা এবং এ ব্যাপারে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করা।

চতুর্থ কর্তব্য: সকল ইহুদি, আমেরিকান, ইংরেজ এবং যেকোনো রাষ্ট্র ও কোম্পানি—যারা ইহুদিদের সমর্থন করছে, সাহায্য করছে, সবগুলোকে অর্থনৈতিকভাবে সম্পূর্ণরূপে বয়কট করা।

পঞ্চম কর্তব্য: মহান আল্লাহর কাছে কায়মনোবাক্যে একাগ্রচিত্তে দোয়া করতে থাকা।

ষষ্ঠ কর্তব্য: ব্যক্তি ও সমাজকে পরিশুদ্ধ করা।

সামনের কয়েক পৃষ্ঠায় আমরা এই দায়িত্বগুলোর ব্যাপারে আলোচনা করব। আমরা আল্লাহর কাছে তাওফিক প্রার্থনা করি।

—রাগিব সারজানি

অনুবাদকের কথা

বাংলা ভাষায় ফিলিস্তিন সম্পর্কে অনেক বইপত্র রয়েছে। অপরদিকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বাংলায় এখনও কাজের যথেষ্ট অভাব। এমতাবস্থায় কাজ না হওয়া গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কাজ না করে কাজ হওয়া ফিলিস্তিন বিষয়ে আরেকটা বই করার কী দরকার ছিল? মনের মধ্যে প্রশ্নটা জাগা খুব স্বাভাবিক। আমার নিজের মনেও প্রশ্নটা জেগেছিল। প্রশ্নটার উত্তর জানতে হলে আমাদেরকে যেতে হবে বন্ধু কায়েস শরীফ ভাইয়ের কাছে। কায়েস ভাইই বইটা আমাকে অনুবাদের জন্য দিয়েছিলেন। তাঁকে প্রশ্নটা করার পর জবাবে বলেছিলেন, ফিলিস্তিনের মুক্তির জন্য আমরা এই মুহূর্তে আমাদের অবস্থান থেকে কী করতে পারি, এটা আমি কেবল এ বইয়েই পেয়েছি; অন্য কোনো বইয়ে পাইনি।

আমি নিজেও বইটা পড়ে এমনটাই পেয়েছি। অন্যান্য বইয়ে দেখা যায় ফিলিস্তিনের ইতিহাস থাকে, বর্তমান পরিস্থিতির উল্লেখ থাকে, ইহুদিদের অন্যায়-অপকর্মের কথা থাকে, হামাস ও মুজাহিদদের সফলতার আলোচনা ইত্যাদি থাকে। কিন্তু পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে থাকা মুসলিমরা ফিলিস্তিনের জন্য কী করতে পারে, আমরা বাংলাদেশে থেকে ফিলিস্তিনের মুক্তির জন্য কী করতে পারি, এ সম্পর্কে জীবনঘনিষ্ঠ কোনো আলোচনা থাকে না বললেই চলে। তাই বলা যায়, ফিলিস্তিন সম্পর্কে অনেক বইপত্র রচিত-অনূদিত হলেও এখনো এ বিষয়ে ঘাটতি রয়ে গেছে। আমাদের বক্ষ্যমাণ বইটি এই ঘাটতি দূর করার একটা প্রয়াস। এ বইয়ে জীবনঘনিষ্ঠ, বাস্তবিক যে কর্মপদ্ধতি বলা হয়েছে, অন্য কোনো বইয়ে তা নেই।

মিশরের প্রখ্যাত লেখক ড. রাগিব সারজানি ফিলিস্তিন সম্পর্কে বেশ কয়েকটি বই লিখেছেন। তন্মধ্যে '*ফিলিস্তিন লান তাদী*' হচ্ছে আমাদের বক্ষ্যমাণ বইয়ের মূল। তবে বইটি কলেবরে বেশ ছোট। সংক্ষেপ করতে গিয়ে কিছু কথা এতটাই ইঙ্গিতপূর্ণ হয়ে গেছে যে, অনেক পাঠকের বুঝতে রীতিমতো বেগ পেতে হতে পারে। তাই লেখকেরই ফিলিস্তিন বিষয়ে রচিত *ফিলিস্তিন—ওয়াজিবাতুল উম্মাহ, আনতা ওয়া ফিলিস্তিন* এবং *আল-মুকাতআহ* নামক তিনটি বই থেকে কিছু বিষয় সংযোজন করা হয়েছে।

অনুবাদের ক্ষেত্রে মূল বইয়ের মূলানুগ অনুবাদ করার চেষ্টা করেছি। আর সংযোজন অংশে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ভাবানুবাদ এবং খুব সামান্য ক্ষেত্রে ছায়া অনুবাদেরও আশ্রয় নিয়েছি। পাঠকের উপকারের কথা ভেবে কিছু টীকাও সংযুক্ত করে দিয়েছি।

বইটির বর্ধিত অংশে ড. রাগিব সারজানির উল্লিখিত বইগুলো থেকে একই ভাবে কাজটি করেছেন প্রিয় মাহদি হাসান। আল্লাহ তাকে উত্তম বিনিময় দান করুন। এছাড়াও আমাদের এ কাজে যে যেভাবে সহায়তা করেছেন তাদেরও জাযায়ে খায়ের দান করুন।

মহান প্রভুর দরবারে প্রার্থনা, তিনি যেন বইটিকে কবুল করেন, এর অসিলায় আমাদেরকে ক্ষমা করেন, আমাদেরকে জেগে ওঠার ও ফিলিস্তিনের মুক্তির লক্ষ্যে কাজ করার তাওফিক দান করেন, ফিলিস্তিনিদেরকে রক্ষা ও সাহায্য করেন এবং জায়নবাদী হায়েনাদেরকে ধ্বংস করে তাদের হিংস্র থাবা থেকে ফিলিস্তিনকে মুক্তি দেন। আমিন।

—মানসূর আহমাদ
২৫ জানুয়ারি, ২০২০ খ্রিষ্টাব্দ।
gelpenbd@gmail.com

সূচিপত্র

জনমত তৈরি করা-২৫

অতঃপর এই জনমত তৈরির পরিমণ্ডলকে প্রশস্ত করার ব্যাপারে ভাবুন— ২৬
প্রথম বিষয়: কেন আমরা ফিলিস্তিনকে মুক্ত করব? ৩১
মসজিদে আকসা বেশি দামি, নাকি মুসলিমদের রক্ত? ৪৪
ফিলিস্তিনকে কীভাবে মুক্ত করা হবে? ৪৮
যেসব কারণে ইন্তিফাদা চালিয়ে যাওয়া প্রয়োজন ৪৮
আপনার প্রতি এই আন্তরিক উপদেশটি রইল ৪৯
এক. ইন্তিফাদার শিক্ষাগত দিক ৫৩
দুই. ইন্তিফাদা ও স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি ৫৩
তিন. ইন্তিফাদা এবং বিভিন্ন ফিলিস্তিনি দলের মাঝে ঐক্য ৫৩
চার. পুরো মুসলিম বিশ্বকে এক পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধকরণ ৫৪
পাঁচ. ইসরায়েলের প্রতি আমেরিকার নির্লজ্জ সমর্থনের মুখোশ উন্মোচন ৫৪
ছয়. জায়নবাদী জনগোষ্ঠীর ওপর কি ইন্তিফাদার কোনো প্রভাব পড়ছে না? ৫৪
১. ভয়ভীতি ও নিরাপত্তাহীনতা ৫৪
২. ইহুদিদের উল্টো হিজরত ৫৫
৩. ইসরায়েলি বাহিনীতে ভয়াবহ বিশৃঙ্খলা ৫৫
৪. ইহুদিদের কঠিন অর্থনৈতিক লোকসান ৫৫
৫. আন্তর্জাতিক লেনদেনে লোকসান ৫৫
৬. স্বাভাবিক অবস্থা ব্যাহত ৫৬
৭. ইহুদিরা পুরো বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে ৫৬
৮. ইন্তিফাদা পুরো বিশ্বের স্যাটেলাইট টিভি ও ইন্টারনেটে ইহুদিদের অন্যায়-অপরাধ প্রকাশ ৫৬

অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আরেকটা বিষয়-৫৯

ইতিহাসের শিক্ষা ৫৯

আশার সঞ্চার করা-৬৩

মুসলিমরা কেন হতাশ হয়ে পড়ে?! ৬৩
দশটি বাস্তবতা বুঝে নিন ৬৪

ধনসম্পত্তির মাধ্যমে সহযোগিতা করা-৭০

১. আল্লাহর রাস্তায় সম্পত্তি ব্যয় করার শিক্ষা ছড়িয়ে দেওয়া ৭৩
২. দান-খয়রাতের ব্যাপারে মনকে অভ্যস্ত করে তোলা ৭৩
৩. সন্তানাদিকে দান-খয়রাতের ব্যাপারে অভ্যস্ত করে গড়ে তোলা ৭৪
৪. উপার্জনের নির্দিষ্ট একটা অংশ বের করা ৭৫
৫. মাঝেমধ্যে প্রকাশ্যে দান-খয়রাত করা ৭৫
৬. দান-খয়রাতের ব্যাপারে অন্যদেরকে অনুপ্রাণিত করা ৭৭
৭. ফিলিস্তিনের সংকট বিশদভাবে জানার ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করা ৭৭
৮. ফিলিস্তিনের জন্য সম্পত্তির জাকাতের একটা অংশ বের করা ৭৮

বয়কট করা-৮০

বয়কটের উপকারিতা ৮১
বয়কটের দশটি উপকারিতা ৮২
প্রথম উপকারিতা ৮২
দ্বিতীয় উপকারিতা ৮৬
তৃতীয় উপকারিতা ৮৭
চতুর্থ উপকারিতা ৯১
পঞ্চম উপকারিতা ৯৩
ষষ্ঠ উপকারিতা ৯৩
সপ্তম উপকারিতা ৯৪
অষ্টম উপকারিতা ৯৪
নবম উপকারিতা ৯৫
দশম উপকারিতা ৯৫

দোয়া-৯৭

বিপদাপদ, কঠিন পরিস্থিতি ও সংকট থেকে
পরিত্রাণ পাওয়ার বিশেষ কিছু দোয়া ১০০
আল-কুরআনুল কারিমের দোয়াসমূহ— ১০০
হাদিসের দোয়াসমূহ— ১০২
আরও কিছু দোয়া— ১০৫

ব্যক্তি ও সমাজকে পরিশুদ্ধ করা-১০৮

১. আকিদা বিশুদ্ধকরণ ১১১
২. বিচার দিবসের প্রতি গভীর বিশ্বাস ১১২
৩. সর্বদা নিয়তকে নবায়ন করা ১১২
৪. ইবাদতে পূর্ণতা ১১২
৫. উত্তম চরিত্র-মাধুর্যে ভূষিত হওয়া ১১৩
৬. গভীরভাবে রাসুলের জীবনী অধ্যয়ন করা ১১৩
৭. সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ ১১৪
৮. গুনাহ থেকে তাওবা ১১৪
৯. সম্পত্তি পবিত্রকরণ ১১৫
১০. আল্লাহর ফায়সালায় সন্তুষ্ট থাকার ব্যাপারে নিজেকে অভ্যস্ত করা ১১৫
১১. আল্লাহর শত্রুদের সাথে বন্ধুত্বহীনতা ১১৬
১২. সর্বদা নেককারদের জীবনী অধ্যয়ন করা ১১৬
১৩. দুনিয়াবিমুখতা ও দুনিয়ার বোঝা থেকে ভারমুক্ত থাকা ১১৭
১৪. সর্বদা মৃত্যুর কথা স্মরণ করা ১১৮
১৫. ইলমি মজলিসে উপস্থিত হওয়া ১১৯
১৬. ঐক্য গঠন এবং বিভেদ নিরসন ১২০
ক. সমাজে ঐক্যের বাণী ছড়িয়ে দেওয়া ১২১
খ. আকিদার ভিত্তিতে সমাজকে ঐক্যবদ্ধকরণ ১২১
গ. অন্যের মতামত গ্রহণ করার গুরুত্ব অনুধাবন ১২২
ঘ. মতভেদ ও বিরোধ থেকে যথাসম্ভব দূরে থাকা ১২৩
ঙ. মতানৈক্যের সময় ইসলামের মূলনীতি ও শিষ্টাচারের খেয়াল রাখা ১২৩
চ. পরস্পরের মধ্যে মীমাংসা করে দেওয়া ১২৪
ছ. উম্মাহর অভ্যন্তরে ঐক্যের কাঠামো তৈরি করা ১২৪
জ. সমাজে শুরাব্যবস্থার প্রচলন ঘটানো ১২৫
ঝ. ইসলামের ইতিহাসের ঐক্যের ঘটনাবলি অধ্যয়ন করা ১২৫
ঙ. খেলাধুলা, বিনোদন ও হাস্যরস কম করা এবং উম্মাহর মাঝে জিহাদের চেতনা জাগানো ১২৬
ক. খেলাধুলায় সময় কম ব্যয় করা ১২৬
খ. হাস্য-রসিকতা বেশি না করা ১২৭
গ. সময়কে কাজে লাগানো ১২৭
ঘ. সমাজে জিহাদের শিক্ষা ছড়িয়ে দেওয়া ১২৮

উলামায়ে কেরাম এবং দাঈগণের কর্তব্য-১২৯

এক. ঐক্যের ইশতেহার প্রচার এবং বিভেদ-বিচ্ছিন্নতাকে দূরে ঠেলে দেওয়া ১৩০
দুই. ফিলিস্তিন প্রসঙ্গ নিয়ে বিস্তারিত অধ্যয়ন ও পর্যবেক্ষণ; অতঃপর বিস্তারিত আকারে মুসলিম উম্মাহর কাছে এর বিবরণ পেশ করা। এ ক্ষেত্রে করণীয় হচ্ছে— ১৩৩
তিন. ফিলিস্তিন প্রসঙ্গ চাঙ্গা রাখতে করণীয় হচ্ছে ১৩৩
চার. শাসকের প্রতি উপদেশ প্রদান করার ক্ষেত্রে করণীয় ১৩৬
পাঁচ. মুসলিম এবং অমুসলিম রাজনীতিবিদ, সাংবাদিক এবং ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের সাথে যোগাযোগ রাখা এবং পরিস্থিতি অনুযায়ী তাদেরকে সাথে নিয়ে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা ১৩৮
ছয়. বিজয় অর্জনের অসিলা হিসেবে দোয়ার ব্যবহার এবং ফিলিস্তিন প্রসঙ্গকে স্মরণে রাখা ১৩৯
সাত. ফিলিস্তিন সংশ্লিষ্ট ফাতওয়া প্রকাশ করা ১৪০
আট. জনগণকে জিহাদে খরচ করার জন্য উৎসাহ প্রদান ১৪১
নয়. মুসলমানদের অন্তরকে সদা ফিলিস্তিনের জন্য সচকিত রাখা ১৪৩
দশ. জনগণের সাথে আলোচনা করার ক্ষেত্রে কোন বিষয়টিকে প্রাধান্য দিতে হবে সেদিকে লক্ষ রাখা ১৪৪

তরুণ এবং যুবকদের কর্তব্য-১৪৭

যুবক এবং তরুণদের বিশেষ কর্তব্যগুলো হচ্ছে— ১৪৭
এক. 'যে যুবক আল্লাহ তাআলার ইবাদাতে বেড়ে উঠে' এই কথার বাস্তবায়ন ঘটানো ১৪৭
দুই. ফিলিস্তিন প্রসঙ্গের পারিপার্শ্বিক অবস্থা জানা এবং তার ইতিহাস অধ্যয়ন ১৫০
তিন. ইন্টারনেট এবং তথ্যপ্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহার ১৫০
চার. বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ইলেক্ট্রনিক মাধ্যমের জন্য উপযুক্ত প্রবন্ধ লিখা ১৫১
পাঁচ. সম্পদের মাধ্যমে ফিলিস্তিনের অধিকার রক্ষার জিহাদে শামিল হওয়া এবং অল্প অংশকে তুচ্ছ মনে না করা ১৫২
ছয়. ফিলিস্তিনের সাহায্যের জন্য শান্তিপূর্ণ লংমার্চের আয়োজন করা ১৫৪
সাত. সময়ের মূল্যায়ন ১৫৮
আট. ফিলিস্তিনকে সাহায্য করার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার পথে নিজেকে প্রস্তুত করার নিয়ত করা ১৬০
নয়. জায়নবাদী ইহুদিদের হামলায় আহত ফিলিস্তিনিদের জন্য স্বেচ্ছায় রক্তদানের আয়োজন করা ১৬২
দশ. ফিলিস্তিনকে সাহায্যকারী কোনো সংস্থায় যোগ দেওয়া ১৬৩

সাংবাদিক এবং গণমাধ্যমকর্মীদের কর্তব্য-১৬৪

এক. ফিলিস্তিন প্রসঙ্গটিকে সঠিক অর্থে এবং সঠিক শব্দে প্রচার করা ১৬৫
ফিলিস্তিন প্রসঙ্গকে সঠিক শব্দে এবং সঠিক পরিভাষায় প্রচারের
ক্ষেত্রে মিডিয়াকর্মীদের করণীয়— ১৬৫
দুই. ফিলিস্তিনে চলমান ইহুদিদের গণহত্যা এবং নৃশংসতা উন্মোচিত করা ১৬৭
ফিলিস্তিনি জনগণের ওপর জায়নবাদী ইহুদিদের কিছু গণহত্যার
সংক্ষিপ্ত বিবরণ— ১৬৮
ফিলিস্তিনে ইহুদিদের আরও কিছু গণহত্যা ১৭৩
তিন. ফিলিস্তিনের সাহায্যার্থে শক্তি এবং সাহস জাগ্রত করা ১৭৪
চার. মুসলিম উম্মাহকে আল্লাহ তাআলার দিকে প্রত্যাবর্তনে সহায়তা
করা এবং ঐক্যের গুরুত্ব উপস্থাপন করা ১৭৬
পাঁচ. ফিলিস্তিন প্রসঙ্গে পৃথক মিডিয়া প্রতিষ্ঠা করা ১৭৮
ছয়. মুসলিম উম্মাহর মনোবল এবং নৈতিক চেতনাকে সমুচ্চ করা ১৭৯
সাত. ফিলিস্তিনের প্রকৃত চিত্রকে নির্ভরযোগ্যতার সাথে
উপস্থাপন করার জন্য ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকা এবং পশ্চিমা মিডিয়ার
ওপর নির্ভর না করা ১৮০
আট. আন্তর্জাতিক মিডিয়াগুলোর প্রতি লক্ষ রাখা এবং প্রতিক্রিয়া জানানো ১৮১
নয়. শত্রুর শক্তিকে বড় করে না দেখানো ১৮২
দশ. ফিলিস্তিন সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সৃজনশীল প্রতিযোগিতার আয়োজন করা ১৮৩

শিক্ষকগণের কর্তব্য-১৮৫

এক. আদর্শে পরিণত হোন ১৮৫
দুই. এমন একটি প্রজন্ম তৈরি করা, যারা ফিলিস্তিন পুনরুদ্ধারে সক্ষম হবে ১৮৭
তিন. ফিলিস্তিনের জন্য সহায়তামূলক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ ১৮৮
চার. ফিলিস্তিন প্রসঙ্গের বিভিন্ন শিক্ষামূলক কার্যক্রম
গ্রহণ করা এবং শরয়ি দৃষ্টিকোণ থেকে সেগুলোকে পরিচালিত করা ১৮৮
পাঁচ. বয়কটের চিন্তা-চেতনা নিয়ে শিশুদেরকে শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ দেওয়া ১৮৯
ছয়. ছাত্রদের মনে ফিলিস্তিনের জন্য সম্পদ ব্যয় করার প্রতি আগ্রহ জাগ্রত করা ১৯০
সাত. ছাত্রদের মনে সুউচ্চ মনোবল জাগ্রত করা এবং নৈরাশ্যের প্রতিরোধ করা ১৯১
আট. শিক্ষাঙ্গনে সঠিক দৃষ্টিকোণ থেকে ফিলিস্তিনের প্রকৃত বাস্তবতা তুলে ধরা ১৯১
নয়. ফিলিস্তিনের সাহায্যের জন্য বিদ্যালয়ের মসজিদের ভূমিকার প্রয়োগ ১৯২
দশ. পাঠ্যক্রমের ঘাটতিগুলো সমাধান করা ১৯৩

নারীদের কর্তব্য-১৯৪

এক. একটি বিশুদ্ধ এবং সচেতন প্রজন্ম তৈরী করা ১৯৫
দুই. বয়কট প্রয়োগ করা এবং সন্তানদেরকে এর ব্যাখ্যা প্রদান করা ১৯৬
তিন. নারীসমাজে ফিলিস্তিন প্রসঙ্গ ছড়িয়ে দেওয়া ১৯৭
চার. সন্তানদেরকে ফিলিস্তিনের প্রতি ভালোবাসার শিক্ষা দিয়ে লালনপালন করা ১৯৮
পাঁচ. ফিলিস্তিনি নারীদের সাথে যোগাযোগ রাখা ২০০
ছয়. অলংকার ইত্যাদি দান করার মাধ্যমে জিহাদে শরিক হওয়া ২০০
এ ক্ষেত্রে একজন নারীর জন্য করণীয় হচ্ছে— ২০১
সাত. ফিলিস্তিনের সংবাদ নিয়ে আলোচনা করা ২০১
আট. ফিলিস্তিনের সাহায্যের লক্ষ্যে নারীদের বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করা ২০২
নয়. ফিলিস্তিনের বিজয়ের দৃঢ় বিশ্বাস এবং আশা লালনের চেতনা জাগিয়ে তোলা ২০২
দশ. আদর্শে পরিণত হওয়া ২০৩
একজন আদর্শ মুসলিম নারীর জন্য করণীয় হচ্ছে— ২০৩

ফিলিস্তিনের জিহাদ সংক্রান্ত কিছু ফাতওয়া-২০৬

হে আরব এবং মুসলিম সন্তানগণ! ২০৭
প্রিয় মুসলিম সন্তানগণ! ২০৮
ফিলিস্তিনে জিহাদের হুকুম সম্পর্কে শাইখ খালিদ মুসলিহর ফাতওয়া ২১০
ফিলিস্তিনে ইহুদিদের অধিকার সম্পর্কিত ফাতওয়া ২১২
ফিলিস্তিনি ইন্তেফাদা সম্পর্কে শাইখ ইবনু বাজের ফাতওয়া ২১৭
ফিলিস্তিনের জন্য সম্পদের মাধ্যমে জিহাদ প্রসঙ্গে শাইখ ইবনু বাজের ফাতওয়া ২১৯
ফিলিস্তিনের নাগরিকদের সাহায্যার্থে জাকাত প্রদানের ব্যাপারে মিশরের দারুল ইফতার ফাতওয়া ২১৯
শেষ কথা ২২৭
গ্রন্থপঞ্জি ২৩১

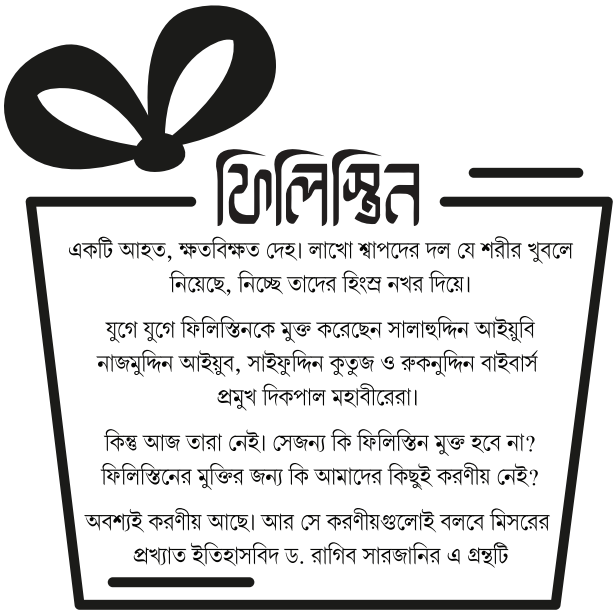

ফিলিস্তিন

একটি আহত, ক্ষতবিক্ষত দেহ। লাখো শ্বাপদের দল যে শরীর খুবলে নিয়েছে, নিচ্ছে তাদের হিংস্র নখর দিয়ে।

যুগে যুগে ফিলিস্তিনকে মুক্ত করেছেন সালাহুদ্দিন আইয়ুবি নাজমুদ্দিন আইয়ুব, সাইফুদ্দিন কুতুজ ও রুকনুদ্দিন বাইবার্স প্রমুখ দিকপাল মহাবীরেরা।

কিন্তু আজ তারা নেই। সেজন্য কি ফিলিস্তিন মুক্ত হবে না? ফিলিস্তিনের মুক্তির জন্য কি আমাদের কিছুই করণীয় নেই?

অবশ্যই করণীয় আছে। আর সে করণীয়গুলোই বলবে মিসরের প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ ড. রাগিব সারজানির এ গ্রন্থটি

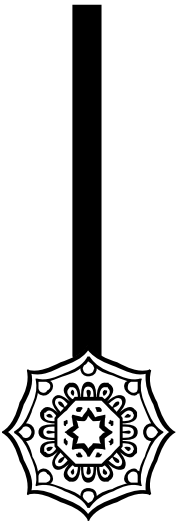

জনমত তৈরি করা

ফিলিস্তিন ইস্যুটা যেন কখনো স্তিমিত হয়ে না যায় কিংবা ব্যাপারটাকে যেন কখনো ভুলে না যাওয়া হয়।

সুবহানাল্লাহ! আল্লাহ তাআলাই এই ইস্যুকে আমাদের জন্য চাঙা করে দিয়েছেন। মনে করে দেখুন, অসলো চুক্তির পর বেশকিছু সময়—প্রায় পূর্ণ সাত বছর—এর জন্য ফিলিস্তিন ইস্যুটা চাপা পড়ে গিয়েছিল। কিন্তু ২০০০ খ্রিষ্টাব্দের ২৮ সেপ্টেম্বর এরিয়েল শ্যারন কর্তৃক মসজিদে আকসা পরিদর্শন করার মধ্য দিয়ে আল্লাহ তাআলা ইস্যুটা আবারও চাঙা করে দিয়েছেন। অথচ এই ঘটনাটা বড় হওয়া সত্ত্বেও পূর্ববর্তী অনেক ঘটনা থেকে এটা ছিল তুচ্ছ-নগণ্য। এরিয়েল শ্যারনের মসজিদে আকসা পরিদর্শনের আগে এমন অনেক ঘটনা অতিবাহিত হয়েছে, যেগুলোর জন্য মুসলিমরা এভাবে জেগে ওঠেনি; রুখে দাঁড়ায়নি। মুসলিমদের ওপর হত্যাযজ্ঞ সংঘটিত হয়েছে; বাড়িঘর বিধ্বস্ত করা ও মুসলিমদের ঘরবাড়ি-ছাড়া করার ঘটনা ঘটেছে; সবরা ও শাতিলার মতো হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে। কিন্তু তারা এরিয়েল শ্যারনের পরিদর্শনের ইস্যুকে কেন্দ্র করে জেগে ওঠেছে। অথচ এই ঘটনাটা মুসলিমদের ওপর হত্যাযজ্ঞের ঘটনার চেয়ে তুচ্ছ। সুতরাং আল্লাহ তাআলাই ফিলিস্তিন ইস্যুকে চাঙা করে দিয়েছেন। আমাদের জন্য (ইস্যু চাঙা করার) এই নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করা আবশ্যক। আর এই নিয়ামতের শুকরিয়া হবে ইস্যুটাকে ধারাবাহিক চাঙা রাখার মাধ্যমে।

ফিলিস্তিনের ব্যাপারে কোনো আলাপ-আলোচনা ব্যতীত আপনার এক-দু দিন অতিবাহিত হয়ে যাওয়া থেকে সাবধান থাকুন!

বিষয়টার গুরুত্ব অনুধাবন করুন, পদক্ষেপ নিন।

প্রতিটা মহলে পদক্ষেপ নিন।

প্রত্যেক স্থানে পদক্ষেপ নিন।

প্রতিটা সময়ে পদক্ষেপ নিন।

প্রত্যেক পরিস্থিতিতে পদক্ষেপ নিন।

- আপনার বাড়ির পরিমণ্ডলে ফিলিস্তিন নিয়ে আলোচনা করুন। আপনার বাবার সঙ্গে, মায়ের সঙ্গে; আপনার ভাইয়ের সঙ্গে, বোনের সঙ্গে; আপনার সন্তানাদির সঙ্গে, নাতি-নাতনির সঙ্গে ফিলিস্তিনের ব্যাপারে কথা বলুন।
- আপনার আত্মীয়স্বজনের পরিমণ্ডলে ফিলিস্তিন নিয়ে আলোচনা করুন। নিকটাত্মীয়, দূরবর্তী আত্মীয়; আপনার পরিবারের যত আত্মীয়কে আপনি চেনেন, সবার সঙ্গে ফিলিস্তিনের ব্যাপারে কথা বলুন।
- আপনার বন্ধুবান্ধবদের পরিমণ্ডলে ফিলিস্তিন নিয়ে আলোচনা করুন। আপনার কর্মক্ষেত্রে ফিলিস্তিনের ব্যাপারে কথা বলুন। এই সংকটপূর্ণ সময়ে খেলাধুলা, টুর্নামেন্ট, লীগ, বিশ্বকাপ, সিরিয়াল, ধারাবাহিক নাটক, মুভি, অমুক ব্যক্তি, তমুক বিষয় ইত্যাদি সম্পর্কে আমাদের কথাবার্তা, বিতর্ক সব একপাশে ফেলে রাখা আবশ্যক। এই সবকিছু পরিহার করে আসুন ফিলিস্তিন নিয়ে কথা বলি।
- এমনকি বাইরের কোনো পরিমণ্ডল, যেখানে আপনি ঘটনাচক্রে, কোনো পূর্বপ্রস্তুতি ছাড়াই উপস্থিত হয়ে গেছেন, সেখানেও ফিলিস্তিন নিয়ে কথা বলুন। আপনি কোনো ডাক্তারখানায় অপেক্ষা করছেন, ফিলিস্তিন নিয়ে কথা বলুন। আপনি কোনো বাস, মাইক্রোবাস বা ট্যাক্সিতে বসে আছেন, ফিলিস্তিন নিয়ে কথা বলুন।

অতঃপর এই জনমত তৈরির পরিমণ্ডলকে প্রশস্ত করার ব্যাপারে ভাবুন—

- কোনো সংবাদপত্রে ফিলিস্তিন নিয়ে একটা কলাম লিখুন কিংবা কোনো পত্রিকায় একটা বার্তা দিন।
- মাদরাসা বা বিশ্ববিদ্যালয়ের দেয়ালিকায় একটা প্রবন্ধ লিখুন।
- মসজিদে, ক্লাসে বা রাস্তায় দু-তিন মিনিটের ত্বরিত কিছু সাধারণ বক্তব্য রাখুন; কোনো শহিদি অপারেশন সম্পর্কে সংবাদপ্রদান কিংবা ফিলিস্তিনিদের জন্য দোয়া প্রার্থনা করুন।

- আপনি সক্ষম হলে জুমার খুতবা দিন। আর না হয় খতিব সাহেবকে এ ব্যাপারে পরামর্শ দিন।

- আপনার ঘরে একটা সাংস্কৃতিক বৈঠক করুন। বৈঠকে আপনার বন্ধুদেরকে দাওয়াত দিন। ফিলিস্তিন ইস্যু নিয়ে আলোচনা করুন। বিষয়টার গুরুত্ব বোঝাতে তাদের সঙ্গে কথোপকথন বা সাক্ষাৎকার বৈঠক আহ্বান করতেও কোনো বাধা নেই। তাদের সঙ্গে কথোপকথন করুন, ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করুন।

- ইন্টারনেটে আপনার পরিচিত যেকোনো ব্যক্তি এবং পৃথিবীর যেকোনো প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনের কাছে কিছু বার্তা পাঠান। মুসলিম-অমুসলিম সবার কাছে মেসেজ দিন। তাদের কাছে ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করুন। ইহুদিদের দোষত্রুটি তুলে ধরুন। ইহুদিদের প্রচার-মিডিয়ার বিপরীতে আপনি বিশ্বব্যাপী একটি জনমত তৈরি করুন। জেগে উঠুন, জাগিয়ে তুলুন। এখন আর (অবহেলায় কাটানোর) সময় নেই।

- ফিলিস্তিনের মুক্তির জন্য উপকারী জ্ঞানগত বিষয়াদি প্রচার করতে পারেন। যেমন : ফিলিস্তিন ইস্যুতে বিশুদ্ধ চিন্তাধারায় লেখা ছোট কোনো পুস্তিকা বা লিফলেট বিতরণ করতে পারেন, সর্বত্র এগুলো বিলি করতে পারেন। অথবা এ ব্যাপারে কোনো অডিও রেকর্ড বা সিডি পরিবেশন করতে পারেন। কিংবা কোনো স্যাটেলাইট প্রোগ্রাম প্রচার করতে পারেন, যে প্রোগ্রামের মাধ্যমে ফিলিস্তিন ইস্যুটাকে ব্যাখ্যা করা হবে, ইহুদিদের ভ্রান্ত দাবিসমূহের খণ্ডন করা হবে এবং ফিলিস্তিনের মুক্তির জন্য কার্যকর পদক্ষেপ নিতে আহ্বান জানানো হবে। অথবা ইন্টারনেটে লোকজনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে পারেন, যাদের সঙ্গে ফিলিস্তিনের মুক্তির ব্যাপারে কথা বলবেন।

- মানুষকে জাগিয়ে তুলতে নতুন নতুন মাধ্যম আবিষ্কার করা যেতে পারে। ফিলিস্তিন ইস্যুতে জাগরণ সৃষ্টি করার অনেক মাধ্যম রয়েছে, যেগুলো পুরোনো ও বহুল চর্চিত। তাই বর্তমানে সেগুলোর সংস্কার করা এবং নতুন নতুন মাধ্যম আবিষ্কার করা দরকার। ফিলিস্তিন ইস্যুকে চাঙা রাখতে, এ ব্যাপারে মানুষের মাঝে জাগরণ সৃষ্টিকে অব্যাহত রাখতে এবং ইস্যুটা মনের মধ্যে সদা জাগরূক রাখতে এ ব্যাপারে প্রযুক্তিগত কোনোকিছু আবিষ্কার করা যেতে পারে; কিংবা কবিতা, গল্প বা নাটক ইত্যাদি সৃজনশীল রচনা তৈরি করা যেতে পারে; বাচ্চাদের মাঝে ফিলিস্তিনের মুক্তির ব্যাপারে চেতনা সৃষ্টি করতে কোনো ভিডিওগেম বানানো যেতে পারে বা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা যেতে পারে; পুরোনো ধ্যানধারণা ও চিন্তাকে নবায়ন করতে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, ভ্রমণ বা সমাবেশের আয়োজন করা যেতে পারে।

❖ এমনকি শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভকেও এ ব্যাপারে একটা পদক্ষেপ হিসেবে গণ্য করা হয়। তবে বিক্ষোভ মিছিলকে পদক্ষেপ হিসেবে গণ্য করা সত্ত্বেও তা হতে হবে শরয়ি নীতিমালা অনুযায়ী। এমনকি আমেরিকান বা অন্য কোনো ভিনদেশি দোকানপাটও ভাঙচুর করা যাবে না বা ধ্বংস করা যাবে না। কেননা, তারা আমাদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ। আর মুসলিমরা চুক্তি ভঙ্গ করে না। বিক্ষোভ মিছিলে কোনো গালিগালাজও করা যাবে না। কেননা, 'মুমিন কখনো নিন্দা ও অপবাদ আরোপকারী হয় না, অভিসম্পাতকারী হয় না এবং অশ্লীল ও কটুভাষী হয় না।'[১] বিক্ষোভ মিছিলে ইসলামি শিষ্টাচার পরিপন্থী কোনো বিশৃঙ্খলাও করা যাবে না; ভ্রান্ত কোনো স্লোগানও দেওয়া যাবে না। কারণ, এসব কর্মকাণ্ড ব্যাপারটাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পরিবর্তে আরও পিছিয়ে দেবে।

বন্ধুরা, এই পদক্ষেপটি দ্রুত নিতে হবে। বাস্তবেই এখন আর (অবহেলায় কাটানোর) সময় নেই।

কোনো কাজ ছাড়া সময় অতিবাহিত হওয়া ফিলিস্তিন ইস্যুর জন্য কল্যাণকর নয়। কেননা—

➢ সময় অতিবাহিত হওয়ার সঙ্গে শহিদদের সংখ্যাও বাড়তে থাকবে; মুসলিম উম্মাহ একের পর এক তার সদস্যদের হারাতে থাকবে।

➢ সময় অতিবাহিত হওয়ার সঙ্গে বাড়িঘর বিধ্বস্ত হতে থাকবে; মুসলিমদের ভূমি হাতছাড়া হতে থাকবে; মানুষ বিভক্ত-বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে থাকবে; উদ্বাস্তুদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকবে। এই সবগুলো ব্যাপার ইহুদিদের চাপের মাত্রা অনেক বাড়িয়ে দেবে।

➢ সময় অতিবাহিত হওয়ার সঙ্গে ইহুদিদের বসতি স্থাপন বেড়ে যাবে; ফিলিস্তিনিদের ভূমিতে ইহুদিদের হিজরত বেড়ে চলবে; ফিলিস্তিনি জনগণের জায়গায় ইহুদিদের প্রতিষ্ঠিতকরণও বেড়ে যাবে।

➢ সময় অতিবাহিত হওয়ার সঙ্গে ফিলিস্তিনিদের খাদ্য, পোশাক, ওষুধপথ্য হ্রাস পেতে থাকবে। যেহেতু তাদের জন্য সবগুলো সীমান্ত ও ক্রসিং বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

➢ সময় অতিবাহিত হওয়ার সঙ্গে মুসলিমদের ওপর ইহুদিদের দুঃসাহস বেড়ে যাবে। তখন আমরা নতুন অনেক বিষয় বারংবার শুনতে পাব—

- আমরা শুনব নির্দিষ্ট কিছু ব্যক্তিবর্গকে গুপ্তহত্যার কথা।

---

[১] কথাটা *সুনানুত তিরমিজি*র ১৯৭৭ নম্বর হাদিস থেকে গ্রহণ করা হয়েছে।—অনুবাদক।

- আমরা শুনব নির্দিষ্ট কিছু ব্যক্তিবর্গকে নিজ ঘর থেকে অপহরণের খবর।
- আমরা শুনব হেলিকপ্টার ও অ্যাপাচি দিয়ে বোমাবর্ষণের কথা।
- আমরা শুনব ট্যাংক ও বুলডোজার দিয়ে আক্রমণের কথা।
- আমরা শুনব গণহত্যার কথা। আর দেখতে পাব সারা বিশ্বের লজ্জাজনক নীরবতা!

সময় অতিবাহিত হওয়ার সঙ্গে ভয়াবহ একটা ব্যাপার ঘটবে, আমি যার নাম দিয়েছি 'করুণ ট্রাজেডির বন্ধুত্ব'!

- মুসলিমরা রক্তপাতের দৃশ্যের সাথে অভ্যস্ত হয়ে যাবে।
- শত-সহস্র আহতদের দৃশ্যের সাথে অভ্যস্ত হয়ে যাবে।
- সন্তান হারানো মায়েদের দৃশ্যের সাথে অভ্যস্ত হয়ে যাবে।
- বাস্তুচ্যুত-শরণার্থী কান্নারত শিশুদের দৃশ্যের সাথে অভ্যস্ত হয়ে যাবে।
- বিধ্বস্তকরণ, অপসারণ, জুলুম-নির্যাতন-নিপীড়ন ও বিনাশসাধনের দৃশ্যগুলোর সাথে অভ্যস্ত হয়ে যাবে।

সময় অতিবাহিত হওয়ার সঙ্গে একসময় মুসলিমরা এই সবগুলো দৃশ্যের সাথেই অভ্যস্ত হয়ে যাবে। তাদের অন্তর ইতিপূর্বে যেমন নাড়া দিত, তখন আর তেমন নাড়া দেবে না; তাদের অশ্রু ইতিপূর্বে যেমন প্রবাহিত হতো, তখন আর তেমন প্রবাহিত হবে না; তাদের অনুভূতিগুলো ইতিপূর্বে যেমন উদ্বেলিত-বিচলিত হতো, তখন আর তেমন বিচলিত হবে না। এটাই করুণ ট্রাজেডির সাথে বন্ধুত্ব!

তা ছাড়া আপনি কি জানেন, এই পৃথিবীতে আপনি কতক্ষণ বেঁচে থাকবেন? হঠাৎ মৃত্যু এসে উপস্থিত হবে। যে মারা যাবে, তার কিয়ামত সংঘটিত হয়ে যাবে। নিঃসন্দেহে আমরা সেসব লোকদের সম্বন্ধেও জিজ্ঞাসিত হব, যারা আমাদের থেকে মাত্র কয়েক মাইল দূরে সকাল-সন্ধ্যা হত্যার শিকার হচ্ছে। বিষয়টাকে সহজভাবে নেওয়ার কোনো সুযোগ নেই।

সমস্যাটা ভালোভাবে উপলব্ধি করতে আপনি নিজেকে তাদের জায়গায় ভাবুন। খুব বেশি দেরি নেই, অচিরেই আল্লাহ তাআলা পরিস্থিতি পাল্টে দেবেন। কল্পনা করুন, আপনি (ফিলিস্তিনের) একটা রাস্তা দিয়ে হাঁটছেন। আপনার সঙ্গে আছে আপনার ৮ বা ১০ বছরের এক ছেলে। এমন সময় এক ইহুদি এসে একটা গুলি ছুড়ল, যা আপনার ছেলের বুকে বা মাথায় বিদ্ধ হলো। ফলে সে আপনার সামনেই ঢলে পড়ল। আপনি তার কোনো চিকিৎসাও করতে পারলেন না। শেষপর্যন্ত সে আপনার চোখের সামনে মারা গেল। এরপর আপনি মাথা উঠিয়ে দেখলেন, শতকোটিরও বেশি মুসলিম এই দৃশ্য

দেখছে, কিন্তু কোনো পদক্ষেপ নিচ্ছে না। তখন আপনি কী করবেন? আপনি কি আকাশের দিকে হাত তুলে সেসব লোকের বিরুদ্ধে বদদোয়া করবেন না, যারা এসব দেখছে, কিন্তু কেন পদক্ষেপ নিচ্ছে না? আপনি কি সেসব লোকের বিরুদ্ধে বদদোয়া করবেন না, যারা এসব শুনছে, কিন্তু বুঝতে চেষ্টা করছে না?

আপনি নিজেকে এই স্থানে কল্পনা করুন!

আপনি কি এসব মজলুমের বদদোয়াকে ভয় পান না, যারা তাদের সেসব দ্বীনি ভাইদের ওপর বদদোয়া করে, যারা মজলুম মুসলিমদের প্রাণ বেরিয়ে যেতে দেখে, ভূমি কেড়ে নিতে দেখে, জনগণকে বিভক্ত হয়ে যেতে দেখে; এসব দেখার পর সামান্য আক্ষেপ করে; কিন্তু তাদের জীবন আগের মতোই স্বাভাবিকভাবে চলতে থাকে... (মজলুম মুসলিমদের পক্ষে কোনো পদক্ষেপ নেয় না।)?

ফিলিস্তিন ইস্যুতে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া আবশ্যকীয় দায়িত্ব। এই পদক্ষেপই ব্যাপারটাকে স্তিমিত হয়ে যাওয়া বা ভুলে যাওয়া থেকে রক্ষা করবে। তবে পদক্ষেপটা অবশ্যই সঠিক ধারণা ও বুঝের মাধ্যমে হতে হবে।

ভুল ধারণার মাধ্যমে ইস্যুটাকে চাঙা করতে চাইলে আরও ক্ষতি হবে, এর গতিকে থামিয়ে দেবে, এমনকি এর মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করবে।

তাই বিষয়টা সঠিকভাবে বুঝতে এবং অন্যদেরকে বোঝাতে সময় দেওয়া প্রয়োজন।

ইসলামকে মিটিয়ে দিতে এবং মুসলিমদেরকে ধ্বংস করে দিতে ইসলামের শত্রুরা অসংখ্য ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত করছে। তারা থামছে না, ক্লান্ত-শ্রান্ত হচ্ছে না। আমাদের শত্রুদের এমন তৎপরতার বিপরীতে আমাদেরও সেই অনুপাতে কিংবা তারচেয়েও বেশি পদক্ষেপ নিতে হবে। ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে তাদের ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তসমূহ—

- বিভিন্ন আলাপ-আলোচনা, দূতাবাস, সংস্থা ও জোটের মাধ্যমে 'রাজনৈতিক চক্রান্ত'।
- বাহিনী, রকেট, বিমান ও যুদ্ধজাহাজের মাধ্যমে 'সামরিক চক্রান্ত'।
- অর্থনৈতিক অবরোধ ও নিষেধাজ্ঞা, ঋণ ও বিশ্বায়নের মাধ্যমে 'অর্থনৈতিক চক্রান্ত'।
- মুসলিম জনগণ এবং একই সম্প্রদায়ের লোকদের মাঝে এমনকি একই পরিবারের লোকদের মাঝে বিভেদ-বিভাজন সৃষ্টি করার লক্ষ্যে 'বিভেদমূলক চক্রান্ত'।
- মিডিয়া, ডিশ, ইন্টারনেট, টেলিভিশন এবং হলুদ সাংবাদিকতার দ্বারা মুসলিমদের চরিত্র নষ্ট করার মাধ্যমে 'চারিত্রিক চক্রান্ত'।
- মুসলিমদের চিন্তাচেতনাকে পরিবর্তন করে দেওয়া, সঠিক আদর্শ বদলে দেওয়া এবং নিরপেক্ষ মানদণ্ড পাল্টে দেওয়ার মাধ্যমে 'বুদ্ধিবৃত্তিক চক্রান্ত'।

এই সবগুলো চক্রান্তই ভয়ংকর। সবগুলোই ধ্বংসাত্মক ও মারাত্মক।

তবে এই সবগুলোর মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তিক চক্রান্তটাই সবচেয়ে বেশি মারাত্মক।

বুদ্ধিবৃত্তিক চক্রান্ত হককে বাতিল ও বাতিলকে হকে পরিবর্তন করে দেয়।

মনে করুন, কিছু লোক দীর্ঘ জীবনযাপন করল; সংগ্রাম করল, ক্লান্ত-শ্রান্ত হলো, জাগ্রত থাকল, অনেককিছু ত্যাগ করল—কেবলই কিছু ভ্রান্ত চিন্তা, বিকৃত আকিদা-বিশ্বাস ও তুচ্ছ-নগণ্য লক্ষ্যের জন্যে। 'অথচ তারা মনে করছে যে, তারা ভালো কাজই করছে!'[২]

এটা ভয়াবহ এক বিপর্যয়! বুদ্ধিবৃত্তিক চক্রান্ত যেকোনো জাতিকে একেবারে মূলোৎপাটন করে দেয়।

মানুষের চিন্তাভাবনা বিকৃত হয়ে গেলে মুক্তি পাওয়ার আর আশা থাকে না।

যে ব্যক্তি সঠিক পথ থেকে সামান্য পরিমাণও বিচ্যুত হয়ে যায়, তার আর গন্তব্যে পৌঁছার আশা করা যায় না।

অনেকেই ফিলিস্তিনের জন্য সংগ্রাম করছে, তারা ভ্রান্ত চিন্তা ও ভ্রষ্ট ধারণা থেকে ফিলিস্তিন রক্ষার সংগ্রাম করছে। ফলে তারা ফিলিস্তিনের মুক্তির ব্যাপারটাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পরিবর্তে আরও পিছিয়ে দিচ্ছে কিংবা নষ্ট করছে।

ফিলিস্তিনের মুক্তি সংগ্রামের অন্যতম শক্তিশালী অস্ত্র হচ্ছে সঠিক বুঝের মাধ্যমে এ বিষয়ে জাগরণ ও চেতনা সৃষ্টি করা।

আসুন, এ ব্যাপারে আমাদের ধারণাগুলি পরখ করে নিই।

প্রথম বিষয়: কেন আমরা ফিলিস্তিনকে মুক্ত করব?

ফিলিস্তিনের জন্য আন্দোলন-সংগ্রাম করা, সম্পত্তি, প্রচেষ্টা ও সময় ব্যয় করা এবং প্রাণ বিলিয়ে দেওয়ার পেছনে কারণটা কী?

কেন আমরা ফিলিস্তিনের জন্য উৎসাহ দেখাব?

এ ব্যাপারে লোকজন বিভিন্ন ধরনের অভিব্যক্তি তুলে ধরবে।

- কেউ বলবে, আমরা ফিলিস্তিনকে মুক্ত করব; কেননা, ফিলিস্তিন একটি আরব রাষ্ট্র। আর আমরাও আরব। আরব জাতীয়তাবাদের কারণেই ফিলিস্তিনকে আমাদের মুক্ত করা প্রয়োজন।

[২] উদ্ধৃতাংশটুকু সুরা কাহফের ১০৪ নম্বর আয়াত থেকে গ্রহণ করা হয়েছে।—অনুবাদক।

- কেউ বলবে, আমরা ফিলিস্তিনকে মুক্ত করব; যেহেতু সেখানে পবিত্র শহর আল-কুদস (জেরুসালেম) রয়েছে।
- কেউ বলবে, আমরা ফিলিস্তিনকে মুক্ত করব; কারণ, এখানে রয়েছে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মেরাজের রাতের স্টেশন, মুসলিমদের প্রথম কিবলা ও তৃতীয় হারাম শরিফ মসজিদে আকসা।
- কেউ বলবে, পৃথিবীর বাস্তুচ্যুত শরণার্থীদের সমস্যা সমাধানের জন্য আমরা ফিলিস্তিনকে মুক্ত করব।
- কেউ বলবে, ফিলিস্তিন ইসলামি রাষ্ট্র হওয়ায় আমরা ফিলিস্তিনকে মুক্ত করব।
- কেউ বলবে, পূর্বোক্ত সবগুলো কারণেই আমরা ফিলিস্তিনকে মুক্ত করব। কেননা, তা আরব রাষ্ট্র; কেননা, তা ইসলামি রাষ্ট্র; কেননা, সেখানে রয়েছে আল-কুদস; কেননা, সেখানে আছে মসজিদে আকসা। আর শরণার্থীদের সমস্যা সমাধানের জন্যও আমরা ফিলিস্তিনকে মুক্ত করতে চাই।

হ্যাঁ, এই সবগুলোর কারণে আপনি ফিলিস্তিনের জন্য আন্দোলন-সংগ্রাম করতে পারেন। কিন্তু জেনে রাখুন, এই সবগুলো বিষয়ের মধ্য থেকে আপনি যদি যেকোনো একটা নির্ধারণ না করেন, তবে আপনি পথ হারিয়ে ফেলবেন, আপনার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়বেন। আপনার মনোযোগকে বিভক্ত করবেন না। বিষয়গুলোর প্রতি নজর দিন, আর এই সবগুলোর মধ্য থেকে যেকোনো একটিকে উদ্দেশ্য হিসেবে বেছে নিন—ফিলিস্তিনকে কেন মুক্ত করবেন?

- এটি একটি আরব রাষ্ট্র বলে?
- নাকি এটি একটি ইসলামি রাষ্ট্র বলে?
- নাকি সেখানে আল-কুদস শহর রয়েছে বলে?
- নাকি সেখানে মসজিদে আকসা রয়েছে বলে?
- নাকি শরণার্থী সমস্যা সমাধানের জন্য?

ভাবুন...

ভালো করে ভাবুন...

আমি (ফিলিস্তিনকে মুক্ত করার কারণ হিসেবে) বেছে নেবো ‘কেননা, ফিলিস্তিন একটি ইসলামি রাষ্ট্র’।

আচ্ছা, 'ফিলিস্তিন ইসলামি রাষ্ট্র' এই কথার তাৎপর্য কী?

ইসলামি শরিয়ত অনুযায়ী যখন কোনো শহর (জয় করে কিংবা সন্ধির ভিত্তিতে) মুসলিমরা শাসন করেন, তখন তা মুসলিমদের মালিকানায় পরিণত হয়ে যায়। এটি কিয়ামত পর্যন্ত চিরস্থায়ী এক বিধান।

এ ব্যাপারে ফিকাহ শাস্ত্রের বড় একটি অধ্যায় রয়েছে, যার নাম 'যুদ্ধলব্ধ ভূমির হুকুম সম্পর্কিত অধ্যায়'। যে ভূমি মুসলিমরা এক দিনের জন্যও জয় করেন, তা ইসলামি ভূমিতে পরিণত হয়ে যায়। এ ব্যাপারে মুসলিম ফিকহ শাস্ত্রবিদগণ একমত।

ফিলিস্তিনের ভূমি ১৩ হিজরিতে মুসলিমদের দ্বারা বিজিত হয় এবং ১৮ হিজরিতে এর বিজয় পূর্ণ হয়।

এর ফলে ফিলিস্তিন ভূমি পুরোটাই ইসলামি ভূমিতে পরিণত হয়।

সে দিন থেকেই ফিলিস্তিন ভূমিতে মুসলিমদের অধিকার শুরু হয়।

আমরা ইহুদিদের মতো বিকৃত তাওরাতের সঙ্গে সম্পর্ক রাখি না; আমরা দ্ব্যর্থহীন এক শরিয়তের সঙ্গে সম্পর্ক রাখি। 'বাতিল এতে অনুপ্রবেশ করতে পারে না—সামনে থেকেও না, পেছন থেকেও না। এটি প্রজ্ঞাময়, সপ্রশংসিতের পক্ষ থেকে নাজিলকৃত।'[৩]

ভূমধ্যসাগর থেকে নিয়ে জর্দান নদী পর্যন্ত এবং লেবানন থেকে নিয়ে রাফাহ পর্যন্ত পুরোটা ভূমিই ইসলামি।

এটাই ইসলামি শরিয়তের ভাষ্য।

তাই ফিলিস্তিনের সামান্য পরিমাণ জমির ব্যাপারে শিথিলতা করার মানে হচ্ছে দ্বীনের ক্ষেত্রে শিথিলতা করা।

আপনি দেখবেন, বর্তমানে ফিলিস্তিনের মুক্তির জন্য সংগ্রামকারীদের মধ্য থেকে কজন লোক এ ব্যাপারটা বুঝে?

আপনি দেখবেন, কত লোক কেবল পশ্চিম তীর ও গাজায় ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করছে, কিন্তু ৭৮% ইসলামি ভূমি ইহুদিদের জন্য ছেড়ে দিচ্ছে!

আপনি দেখবেন, শান্তিবাদীরা 'ভূমিচোর'-'দখলদার'দের সাথে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাসের জন্য নিজেদের দ্বীনের একটা অংশকে ছেড়ে দেবে!

এটা একটা মারাত্মক বুদ্ধিবৃত্তিক সমস্যা!

---

[৩] উদ্ধৃতাংশটুকু সুরা ফুসসিলাতের ৪২ নম্বর আয়াত থেকে গ্রহণ করা হয়েছে।—অনুবাদক।

যে ব্যক্তি গাজা ও পশ্চিম তীরে ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার এবং বাকি ৭৮% ভূমি ইসরায়েলের জন্য ছেড়ে দেওয়ার পক্ষে মত দেয়, সে তো ওই ব্যক্তির মতো, যে প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের পরিবর্তে তিন ওয়াক্ত নামাজের পক্ষে কিংবা পূর্ণ এক মাস রোজার পরিবর্তে দশ দিন রোজা রাখার পক্ষে মত দেয়। কেননা, এটা আল্লাহর বিধান। এতে কোনো রদবদল বা বিকৃতিসাধন করা আমাদের জন্য জায়েজ নেই। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আর আল্লাহ ও তাঁর রাসুল কোনো নির্দেশ দিলে কোনো মুমিন পুরুষ ও নারীর জন্য নিজেদের ব্যাপারে অন্য কিছু এখতিয়ার করার অধিকার থাকে না; আর যে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলকে অমান্য করল, সে স্পষ্টই পথভ্রষ্ট হবে।' [সুরা আহজাব : ৩৬]

আমি বিশ্বাস করি, কোনো মুসলিম আলিমই এমন ফতোয়া দেওয়ার দুঃসাহস দেখাতে পারবে না যে, জাফা (ফিলিস্তিনের সুন্দর একটা শহর) শহরটা ইসরায়েলি শহরে পরিণত হয়ে গেছে, এটা আর ইসলামি শহর নয়। (যদিও আমার জানা আছে যে, জাফা শহরেরই উত্তরাঞ্চলের নাম তেলআবিব।)

তেমনিভাবে আমি বিশ্বাস করি, কোনো মুসলিম আলিমই এমন ফতোয়া দেওয়ার দুঃসাহস দেখাতে পারবে না যে, হাইফা শহরটাকে ইসলামি শহর হিসেবে গণ্য করা যাবে না কিংবা আক্কা (প্রাচীন ইসলামি উপকূলীয় শহর) শহরটাকে মুসলিমদের মালিকানা হিসেবে গণ্য করা যাবে না।

বুঝের কতটা ঘাটতি! চিন্তাভাবনায় কতটা বিকৃতি!

একজন মুসলিম ইহুদি বা খ্রিষ্টানের কাছে তার মালিকানাধীন যেকোনো ভূমি বিক্রি করতে পারলেও ফিলিস্তিনের ভূমি কেন বিক্রি করতে পারবে না? কারণ, জায়নবাদীদের পক্ষ থেকে ফিলিস্তিনকে ইহুদিকরণের পরিকল্পনা এবং তা দখল করে নেওয়ার ফলে এই ভূমি বিক্রি করাটা পুরো ফিলিস্তিনকে হারিয়ে ফেলার কারণ হবে। এই ব্যাপারটা সর্বপ্রথম বুঝতে পেরেছিলেন সুলতান দ্বিতীয় আবদুল হামিদ রাহিমাহুল্লাহ।[৪] তিনি ছিলেন উসমানি খিলাফতের শেষ পর্যায়ের একজন সুলতান।

[৪] সুলতান আবদুল হামিদ বিন আবদুল মাজিদ। তিনি সুদীর্ঘ ৩৩ বছর মুসলিমদের খলিফা হিসেবে ছিলেন। তিনি ১৬ই শাবান ১২৫৮ হিজরি মোতাবেক ২২শে সেপ্টেম্বর ১৮৪২ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৯ই শাবান ১২৯৩ হিজরি মোতাবেক ৩১শে আগস্ট ১৮৭৬ খ্রিষ্টাব্দে খেলাফতপ্রাপ্ত হন। সে সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৩৪ বছর। ১৩১৯ হিজরির মহররম মোতাবেক ১৯০১ খ্রিষ্টাব্দের মে-তে জায়নবাদী থিওডোর হার্জেল তাঁর কাছে কয়েক মিলিয়ন লিরা (তুর্কি মুদ্রা; অন্য বর্ণনামতে ১৫০ মিলিয়ন পাউন্ড) পেশ করে, যেন তিনি ফিলিস্তিনে ইহুদিদের বসতি স্থাপন করার অনুমতি প্রদান করেন। তিনি হার্জেলের আবেদনকে সম্পূর্ণরূপে নাকচ করে দেন এবং তাকে নিজ দরবার থেকে তাড়িয়ে দেন। অনেক বিশৃঙ্খলা ও গন্ডগোল সৃষ্টির পর ইহুদি, খ্রিষ্টান ও পাশ্চাত্যের আদর্শে দীক্ষিত সেকুলারপন্থীরা চক্রান্ত ও 'তরুণ তুর্কি বিপ্লবে'র মাধ্যমে ১৯০৯ খ্রিষ্টাব্দে আবদুল হামিদ রাহিমাহুল্লাহকে ক্ষমতাচ্যুত করে। ২৮শে রবিউল আখির ১৩৩৬ হিজরি মোতাবেক ১০ই ফেব্রুয়ারি ১৯১৮ খ্রিষ্টাব্দে তিনি ইন্তেকাল করেন। তাঁর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে দেখুন— রফিক শাকির নাতশাহ, *আস-*

তিনি উসমানি খিলাফতকে টিকিয়ে রাখতে পূর্ণ প্রচেষ্টা ব্যয় করেছিলেন। তাঁর ইতিহাস পাঠ করা এবং তাঁর জীবনী নিয়ে চিন্তাভাবনা করা প্রত্যেক মুসলিমের ওপর আবশ্যক। সুলতান আবদুল হামিদ রাহিমাহুল্লাহ ইহুদিদের কাছে ফিলিস্তিনের ভূমি বিক্রি করা 'অবৈধ' মর্মে আইন পাস করেন। তখন ছিল ১৮৯০ খ্রিষ্টাব্দ। এই আইন ১৯০৯ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত বলবৎ থাকে। সে সময় ইহুদি, ইংরেজ ও ফরাসিদের মদদপুষ্ট সেকুলার তরুণ তুর্কি দল সুলতান আবদুল হামিদ রাহিমাহুল্লাহকে ক্ষমতাচ্যুত করে ফেলে। তখন থেকেই তারা ইহুদিদের কাছে ফিলিস্তিনি ভূমি বিক্রির অনুমতি দিয়ে দেয়।

ফিলিস্তিনের ভূমি বিক্রি করা হারাম মর্মে প্রকাশিত ফতোয়াগুলোর মধ্যে প্রথম ফতোয়াটা ছিল জেরুসালেমের মুফতি শাইখ আমিন আল-হুসাইনি[৫] রাহিমাহুল্লাহর। তিনি ১৯২২ খ্রিষ্টাব্দে এই ফতোয়া প্রদান করেন। এর পর একের পর এক ফতোয়া আসতে থাকে। তন্মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ফতোয়া ছিল সম্ভবত ফিলিস্তিন ও মুসলিমবিশ্বের আলিমদের সেই ফতোয়া, যা ১৩৫৫ হিজরি মোতাবেক ১৯৩৫ খ্রিষ্টাব্দে জেরুসালেমে অনুষ্ঠিত ইসলামি কনফারেন্সে প্রদান করা হয়েছিল।[৬]

১৯৫৬ খ্রিষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারিতে আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয় একটি ফতোয়া জারি করে যে, ফিলিস্তিনি ভূমির সামান্য অংশের মধ্যেও কোনো শিথিলতা করা জায়েজ হবে না (সামান্য পরিমাণ ফিলিস্তিনি ভূমিও ইহুদিদের হাতে ছেড়ে দেওয়া যাবে না)। অতঃপর কিছুদিন যেতে না যেতেই মুসলিমরা ফিলিস্তিনের ৭৮% বা তারচেয়েও বেশি ভূমিতে ইহুদিদের কর্তৃত্ব স্বীকার করে নেয়! অবশিষ্টাংশও তো চলে যাচ্ছে...

সুলতান আবদুল হামিদ ওয়া ফিলিস্তিন (আস-সুলতান আল্লাজি খাসারা আরশাহু মিন আজলি ফিলিস্তিন) : মাকতাবা মাদবুলি; *মুজাক্কারাতুস সুলতান আবদিল হামিদ আস-সানি* : মুহাম্মাদ হারব কর্তৃক অনূদিত : দারুল কলম, দামেশক : চতুর্থ প্রকাশ : ১৪১৯ হিজরি, ১৯৯৮ খ্রিষ্টাব্দ; ড. আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবি, *সুলতান আবদুল হামিদ*: কাজী আবুল কালাম সিদ্দীক কর্তৃক বাংলায় অনূদিত ও মুহাম্মদ পাবলিকেশন থেকে প্রকাশিত।

[৫] মুহাম্মাদ আমিন আল-হুসাইনি। ১৮৯৭ খ্রিষ্টাব্দে জেরুসালেমে তাঁর জন্ম। তাঁর বাবা ছিলেন জেরুসালেমের মুফতি তাহির আল-হুসাইনি। তাঁর ভাই কামিল আল-হুসাইনির পর ১৯২১ খ্রিষ্টাব্দে তাঁকে জেরুসালেমের মুফতি হিসেবে মনোনীত করা হয়। তিনি ফিলিস্তিনে শরয়ি বিচারব্যবস্থা ফিরিয়ে আনেন; ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন; মসজিদে আকসা ও ডোম অব রক-এর নির্মাণ ও সংস্কার কমিটির সভাপতিত্ব করেন; ইসলামি কনফারেন্সের সভাপতিত্ব করেন; জেরুসালেমের সশস্ত্র গ্রুপ ও জিহাদি বাহিনীগুলোর পৃষ্ঠপোষকতা করেন এবং তাদেরকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করে দেন; তিনি আমৃত্যু ফিলিস্তিনের মুক্তি সংগ্রামে সশস্ত্র জিহাদের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। ১৯৭৫ খ্রিষ্টাব্দে তিনি ইন্তেকাল করেন। বৈরুতের মাকবারাতুশ শুহাদা-তে তাঁকে দাফন করা হয়। তাঁর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে দেখুন—আওনি জাদু উবাইদি, *সাফাহাত মিন হায়াতিল হাজ আমিন আল-হুসাইনি* : মাকতাবাতুল মানার, জারকা, জর্দান : ১৪০৫ হিজরি, ১৯৮৫ খ্রিষ্টাব্দ; হাসানি আদহাম জাররার, *আল-হাজ আমিন আল-হুসাইনি—রাইদু জিহাদ ওয়া বাতালু কাজিয়্যাহ* : দারুজ জিয়া, আম্মান, জর্দান : ১৪০৭ হিজরি, ১৯৮৭ খ্রিষ্টাব্দ।

[৬] বিস্তারিত দেখুন—সালিম আহমাদ সালামাহ, *ফাতাওয়া উলামাইল মুসলিমিন ফি তাহরিমিত তানাজুলি আন আইয়ি জুজইন মিন ফিলিস্তিন আও আন হাক্কিল আওদাতি ইলাইহা*।

'ফিলিস্তিন পুরোটাই ইসলামি' এই বুঝের ওপর ফিকহের গুরুত্বপূর্ণ একটি বিধান সাব্যস্ত হয়। আর তা হচ্ছে, দখলকৃত মুসলিম ভূমিকে মুক্ত করার জন্য সেই ভূমির অধিবাসীদের ওপর জিহাদ করা ফরজ। এটা তাদের ওপর আবশ্যক। ফরজ নামাজ এবং রমজানের রোজার মতো জিহাদও তাদের ওপর ফরজ। সেই ভূমির পুরোটাকে মুক্ত করার জন্য যে জিহাদ করবে না, সে গুনাহগার হবে। এ ব্যাপারে আলিমদের মধ্যে কোনো মতানৈক্য নেই।

মাজমাউল আনহুর গ্রন্থের রচয়িতা বলেন, (এ যুগেও) জিহাদ ফরজ হওয়ার কারণ হচ্ছে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী—'জিহাদ কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে।'[৭] সবাই যদি জিহাদ ছেড়ে দেয়, তবে সবাইই গুনাহগার হবে। শত্রু যদি কোনো মুসলিম শহর বা ভূখণ্ড জয় করে নেয়, তবে জিহাদ ফরজে আইন হয়ে যাবে। তখন স্ত্রী স্বামীর অনুমতি ছাড়া, দাস-দাসি তাদের মনিবের অনুমতি ছাড়া, সন্তান তার বাবা-মার অনুমতি ছাড়া এবং ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি তার ঋণদাতার অনুমতি ছাড়াই জিহাদে বেরিয়ে পড়বে।[৮]

আল-বাহরুর রাইক গ্রন্থের রচয়িতা বলেন, যদি কোনো মুসলিম নারী পৃথিবীর পূর্ব প্রান্তে কাফেরদের হাতে বন্দি হয়, তবে তাকে ছাড়িয়ে আনা পৃথিবীর পশ্চিম প্রান্তের মুসলিমদের ওপরও ফরজ।[৯]

অতএব, শত্রু কর্তৃক দখলকৃত যেকোনো মুসলিম ভূমিকেই মুক্ত করা যদি মুসলিমদের ওপর ফরজ হয়ে থাকে, তবে ফিলিস্তিন ভূখণ্ডের তো এমন কিছু ইসলামি বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যে বৈশিষ্ট্যগুলো দেশটিকে মুক্ত করতে মনোযোগ, আগ্রহ ও উৎসাহ-উদ্দীপনা কয়েকগুণ বাড়িয়ে দেবে। কারণ, ফিলিস্তিন ভূখণ্ড অন্যান্য মুসলিম ভূখণ্ডের মতো নয়।

❖ এই ভূখণ্ডে আল্লাহ তাআলা পৃথিবীবাসীর জন্য বরকত দিয়েছেন।[১০]

❖ এই ভূমিতে রয়েছে মুসলিমদের প্রথম কিবলা, তৃতীয় হারাম শরিফ ও রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মেরাজের স্টেশন মসজিদে আকসা।

---

[৭] হাদিসটি এই শব্দে বর্ণিত হয়েছে—'আমাকে রাসুল বানিয়ে পাঠানোর সময় থেকে নিয়ে জিহাদ চালু রয়েছে এবং আমার উম্মতের সর্বশেষ ব্যক্তিটি দাজ্জালের বিরুদ্ধে লড়াই করা পর্যন্ত এই জিহাদ অব্যাহত থাকবে। কোনো অত্যাচারী শাসকের অত্যাচার কিংবা ন্যায়পরায়ণ শাসকের ইনসাফ জিহাদকে রহিত করতে পারবে না।' *সুনানু আবি দাউদ*: ২৫৩২; *মুসনাদু আবি ইয়ালা*: ৪৩১১; *সহিহুল জামে*: ২৫৩২

[৮] *মাজমাউল আনহুর ফি শারহি মুলতাকাল আবহুর*: ২/৪০৭-৪০৮।

[৯] ইবনু নুজাইম হানাফি, *আল-বাহরুর রাইক ফি শারহি কানাজিদ দাকাইক* : ৫/৭৯। আরও দেখুন—*মাজমাউল আনহুর ফি শারহি মুলতাকাল আবহুর*: ২/৪০৯; ইবনু আবিদিন, *রদ্দুল মুহতার আলাদ্দুররিল মুখতার* : ৪/১২৬-১২৭।

[১০] সুরা ইসরার ১ম আয়াত দ্রষ্টব্য।

❖ বাইতুল মাকদিসের আশপাশেই খাঁটি মুজাহিদরা কিয়ামত পর্যন্ত নিবেদিত থাকবে। আবু উমামা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমার উম্মতের একটি দল সর্বদাই হকের ওপর প্রতিষ্ঠিত (অবিচল) এবং তাদের শত্রুদের ওপর বিজয়ী থাকবে। তাদের সঙ্গ ত্যাগ করে কেউ তাদের কোনো অনিষ্ট করতে পারবে না; একমাত্র কষ্ট ও দারিদ্র্য ছাড়া। এমনকি এভাবে আল্লাহর আদেশ (অর্থাৎ, কিয়ামত) এসে পড়বে, আর তারা যেমন ছিল, তেমনই থাকবে। সাহাবায়ে কেরাম এই দল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে বললেন, হে আল্লাহর রাসুল, তারা কোথায় থাকবে? রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, বাইতুল মাকদিস ও বাইতুল মাকদিসের আশপাশে থাকবে।[১১]

❖ এই ভূমিই হচ্ছে হাশর-নশর ও বিচার দিবসের ভূমি। মাইমুনা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসুল! বাইতুল মাকদিস সম্পর্কে আমাকে অবহিত করুন। তিনি বললেন, এটা হাশরের মাঠ এবং সকলের একত্র হওয়ার ময়দান।[১২]

❖ কেবল এটুকুই নয়; এই পবিত্র ভূমির বিজয় ও মুক্তির পথে বহু মূল্যবান রক্ত খরচ করতে হয়েছে। এই ভূমি জয় করতে লড়াই করেছেন আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ,[১৩] খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ,[১৪] আমর ইবনুল আস,[১৫] শুরাহবিল বিন হাসানাহ, ইয়াজিদ বিন আবু সুফিয়ান, মুআবিয়া বিন আবু সুফিয়ান[১৬] প্রমুখের মতো মহান সাহাবায়ে

---

[১১] *সহিহ মুসলিম* : ৪৮৪৪; *মুসনাদু আহমাদ* : ২২৩৭৪; *তাবারানি, আল-মুজামুল কাবির* : ৮/১৪৫; *হাইসামি, মাজমাউজ জাওয়াইদ ওয়া মানবাউল ফাওয়াইদ*: ৭/২৩০।

[১২] *সুনানু ইবনু মাজাহ*: ১৪০৭; *মুসনাদু আহমাদ*: ২৭৬৬৭; *মুসনাদু আবি ইয়ালা*: ৭০৮৮।

[১৩] আবু উবায়দা আমির বিন আবদুল্লাহ ইবনুল জাররাহ। তিনি ছিলেন প্রথম দিকে ইসলাম গ্রহণকারীদের একজন এবং জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশ সাহাবির অন্যতম। তিনি মুসলিম উম্মাহর সর্বাধিক বিশ্বস্ত লোক। [*সহিহুল বুখারি* : ৪৩৮০; সহিহ মুসলিম : ৬১৪৭] উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু খিলাফতে অধিষ্ঠিত হওয়ার পর খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে সরিয়ে আবু উবায়দা রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাতে শামের মুসলিম বাহিনীর নেতৃত্ব অর্পণ করেন। ১৮ হিজরির উমওয়াস মহামারিতে আক্রান্ত হয়ে আবু উবায়দা রাদিয়াল্লাহু আনহু ইন্তেকাল করেন।

[১৪] প্রসিদ্ধ বীর সাহাবি। ২১ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। আরও দেখুন—ইবনুল আসির, *উসদুল গাবাহ* : ১/৬৭৩।

[১৫] আমর ইবনুল আস বিন ওয়াইল আল-কুরাশি আস-সাহমি। তিনি আরবের চতুর, বিচক্ষণ, বীর, সাহসী ও নেতৃস্থানীয় লোক হিসেবে গণ্য হতেন। মুসলিমরা ইথিওপিয়ায় হিজরত করার পর তাঁদেরকে সেখান থেকে দেশে ফিরিয়ে আনতে কুরাইশের কাফেররা তাঁকে ইথিওপিয়ার বাদশাহ নাজাশির দরবারে পাঠিয়েছিল। ৮ হিজরিতে, মক্কা বিজয়ের পূর্বে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাসনামলে তিনি মিশর বিজয় করেন। তাঁকে দুবার মিশরের গভর্নর নিযুক্ত করা হয় এবং মিশরের গভর্নর থাকাকালীনই ৪৩ হিজরিতে ইদুল ফিতরের দিন তিনি ইন্তেকাল করেন। তাঁকে মুকাত্তাম স্থানে দাফন করা হয়। আরও দেখুন—ইবনুল আসির, *উসদুল গাবাহ*: ৩/৭৪০।

[১৬] মুআবিয়া বিন আবু সুফিয়ান বিন হারব। মক্কা বিজয়ের দিন তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন বিশিষ্ট ওহি লেখক সাহাবি। তাঁর ভাই ইয়াজিদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর মৃত্যুর পর উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে শামের গভর্নর নিযুক্ত করেন। উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুও তাঁকে গভর্নর হিসেবে বহাল রাখেন। উসমান রাদিয়াল্লাহু

কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম। তেমনিভাবে উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু এই ভূখণ্ড ভ্রমণ করেছিলেন এবং জেরুসালেম বিজয়কে সম্পন্ন করেছিলেন।

❖ এই ফিলিস্তিন ভূখণ্ডেই আজনাদাইন ও বাইসানের মতো ইসলামের চির স্মরণীয় কিছু যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে। অতঃপর হিত্তিন ও আইন জালুতের মতো বিরাট কিছু মুক্তি সংগ্রাম সংঘটিত হয়েছে।

মোটকথা, ফিলিস্তিন কোনো সাধারণ ভূখণ্ড নয়। এটি অন্যান্য ভূখণ্ডের মতোও নয়। বরং এর রয়েছে কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য, যা এর মুক্তির জন্য সংগ্রাম করতে, লড়াই চালিয়ে যেতে বিশেষভাবে আগ্রহী, মনোযোগী ও অনুপ্রাণিত করে তোলে।

অতএব, পুরো ফিলিস্তিনকে মুক্ত করার আগপর্যন্ত জিহাদ চালিয়ে যাওয়া ফিলিস্তিনবাসীর ওপর ফরজ। পুরো ফিলিস্তিনকে মুক্ত করার জন্য যদি ফিলিস্তিনবাসী যথেষ্ট না হয়, তবে পার্শ্ববর্তী মুসলিম ভূখণ্ডের ওপরও জিহাদ ফরজ হয়ে যাবে। এভাবে প্রয়োজনে পৃথিবীর সকল মুসলিমের ওপর জিহাদ ফরজ হয়ে যাবে।

বিষয়টা অত্যন্ত গুরুতর। এটা আমাদের জীবনের প্রান্তিক কোনো বিষয় নয়।

স্বভাবতই কেউ কেউ বলবে, এটা (প্রয়োজনে পৃথিবীর সকল মুসলিমের ওপর জিহাদ ফরজ হয়ে যাওয়াটা) তো আন্তর্জাতিক আইন, জাতিসংঘের নীতিমালা ও স্বীকৃত রাষ্ট্রসমূহের সীমানার সাথে সাংঘর্ষিক হয়ে যায়। আর এই স্বীকৃত রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে ইসরায়েলও একটা রাষ্ট্র।

এখানে আমাদের একটু বিরতি দেওয়া দরকার এবং স্পষ্টভাবে জিজ্ঞেস করা দরকার যে, আন্তর্জাতিক আইনের মানে কী?

আন্তর্জাতিক আইন কি মানুষের অধিকার রক্ষা করছে? নাকি কেবলই নিজেদের খেয়ালখুশিমতো জুলুম করে হলেও ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার নিশ্চয়তা দিচ্ছে?

বাস্তবতা হচ্ছে, আন্তর্জাতিক আইন এমন কিছু প্রতীকের নাম, যার পেছনে লুকিয়ে আছে অনেক যুদ্ধাপরাধী ও প্রচুর দুরাচার-শয়তান!

তারা নিজেদের বিকৃত কামনা বাসনা ও ব্যক্তি-স্বার্থ অনুযায়ী জুলুম-নির্যাতন করছে, মানুষকে হত্যা করছে এবং ঘরবাড়ি-ছাড়া করছে। এটাই কি আন্তর্জাতিক আইন?!

আনহুর শাহাদাতের পর তাঁর হত্যাকারীদের বিচারের দাবিতে খলিফা আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর সংঘর্ষ বেধে যায়, যা জঙ্গে সিফফিন বা সিফফিনের যুদ্ধ নামে পরিচিত। অতঃপর আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাহাদাতের পর হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু খিলাফতের পদ থেকে সরে দাঁড়ালে মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু খিলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত হন। তিনি ৬০ হিজরি মোতাবেক ৬৮০ খ্রিষ্টাব্দে ইন্তেকাল করেন। আরও দেখুন—ইবনুল আসির, উসদুল গাবাহ : ৪/৪১৬।

আন্তর্জাতিক আইন দুধ ও খাদ্যাভাবে অর্ধ মিলিয়ন ইরাকি শিশুর মৃত্যুর অনুমোদন দিয়েছে! এটা কী? আন্তর্জাতিক আইনের নামে যারা শাসন করছে, তারা কি মানুষ? তারা কি মানুষের অনুভূতি অনুসারে কাজ করছে? কোনো মানুষ—যেকোনো মানুষ—কি খাদ্যাভাব বা ওষুধের অভাবে তার সামনে কোনো একটি শিশুর মারা যাওয়াটাকে মেনে নিতে পারবে? এটা দেখে সে কি আনন্দিত হতে পারবে? সে কি এই দৃশ্য উপভোগ করতে পারবে? সে কি মানুষ? (কোনো মানুষ যদি তার সামনে একটি শিশুর মৃত্যুই মেনে নিতে না পারে,) তাহলে অর্ধ মিলিয়ন শিশুর মৃত্যুর ব্যাপারে আপনি কী মনে করেন?!

আন্তর্জাতিক আইন আফগানিস্তানে কী করেছে? কী করেছে কাশ্মীরে? কী করেছে সুদান, বসনিয়া, সোমালিয়া আর লেবাননে?

তা ছাড়া আন্তর্জাতিক আইন ফিলিস্তিনে ইসরায়েলের সীমালঙ্ঘনের ব্যাপারে কী করছে? কী ব্যবস্থা নিয়েছে?

সুতরাং এটা একদম স্পষ্ট যে, আন্তর্জাতিক আইন কোনো নিরপেক্ষ-ন্যায়পরায়ণ আইন নয়। আন্তর্জাতিক আইন কেবল শক্তি ছাড়া আর কিচ্ছু চেনে না।

আর মহান আল্লাহ যেহেতু সেই কঠিন জুলুম-নির্যাতনের কথা জানেন, যার অনুসরণ করবে অনেক মানুষ; মহান আল্লাহ যেহেতু জানেন যে, শুধু অধিকার সৃষ্টিজীবের অনেককেই দমন করতে পারবে না; মহান আল্লাহ যেহেতু জানেন যে, অধিকার অবশ্যই শক্তির দ্বারা রক্ষা করতে হবে—এই সবগুলোর কারণে মহান আল্লাহ অধিকার রক্ষার জন্য শক্তি বা জিহাদের অনুমোদন দিয়েছেন।

'যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হলো তাদেরকে, যাদেরকে আক্রমণ করা হচ্ছে। কারণ, তাদের ওপর নির্যাতন করা হয়েছে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদেরকে বিজয় দানে সক্ষম। তাদেরকে নিজেদের বাড়িঘর থেকে অন্যায়ভাবে শুধু এ কারণে বের করে দেওয়া হয়েছে যে, তারা বলে, *"আমাদের রব আল্লাহ"*। আর আল্লাহ যদি মানবজাতির একদলকে অপর দল দ্বারা দমন না করতেন, তবে বিধ্বস্ত হয়ে যেত খ্রিষ্টান সন্ন্যাসীদের আশ্রম, গির্জা, ইহুদিদের উপাসনালয় ও মসজিদসমূহ; যেখানে আল্লাহর নাম অধিক স্মরণ করা হয়। আর আল্লাহ অবশ্যই তাকে সাহায্য করেন, যে তাঁকে সাহায্য করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ শক্তিমান, পরাক্রমশালী।' [সুরা হাজ : ৩৯-৪০]

অতএব, পুরো ফিলিস্তিন ইসলামি—এ ব্যাপারটা ইহুদিরা, তাদের সমর্থক ও সাহায্যকারীরা এবং আন্তর্জাতিক আইন কখনোই মেনে নেবে না। আর ন্যায়পরায়ণ ইসলামি শক্তি (জিহাদ) ছাড়া শক্তিশালী অত্যাচারীদের দমনও করা যাবে না।

আপনাকে অবশ্যই নিজ অধিকার সম্পর্কে জানতে হবে এবং সেই অধিকার ফিরিয়ে আনার সঠিক পদ্ধতি সম্পর্কেও জানতে হবে।

স্বাধীনতা সংগ্রামের অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য সমসাময়িক ও প্রাচীন স্বাধীনতা সংগ্রামগুলোর ইতিহাস পাঠ করা প্রয়োজন। তবে এখানে বিভিন্ন স্বাধীনতা সংগ্রামের অভিজ্ঞতা গভীরভাবে পাঠ করা উদ্দেশ্য নয়। কেননা, এটা তো আলিম ও গবেষকদের কাজ। উম্মাহর সাধারণ লোকদের কাছে এতটুকুই কামনা যে, তারা যেন (এসব ইতিহাস পাঠ করার মাধ্যমে) বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অধিকৃত ভূখণ্ডসমূহ মুক্ত করার সম্ভাব্য পদ্ধতিগুলো বুঝে নেয়। যাতে তারা বুঝতে পারে, উম্মাহর কোন লোকগুলো সঠিক পথে চলছে এবং কারা প্রবৃত্তির কামনায় পড়ে সঠিক পথকে বিকৃত করেছে এবং স্বাধীনতার পথ ও পদ্ধতিকে বিভক্ত করে ফেলেছে।

পূর্ববর্তী লোকদের—চাই তারা মুসলিম হোক অথবা অমুসলিম—স্বাধীনতার এসব অভিজ্ঞতা যারা পাঠ করবে, তারা দেখতে পাবে, বেশিরভাগ দখলদার বাহিনীকে শক্তি ছাড়া দেশ থেকে বিতাড়িত করা যায় না; দখলদার বাহিনীকে বুঝানো ও রাজি করানোর চেষ্টা করে কোনো লাভ হয় না।

এসব ঘটনার প্রকৃতি বুঝতে হলে মুসলিমদের জন্য স্বাধীনতা সংগ্রামের এই অভিজ্ঞতাগুলো পাঠ করা জরুরি। কারণ, তাত্ত্বিক নীতিমালা অনেক সময় কিছু লোককে সন্তুষ্ট করতে পারলেও আরও অনেককে সন্তুষ্ট করতে পারে না। তবে বাস্তব অভিজ্ঞতা ও দৃশ্যগুলো মানুষের মাঝে বিরাট প্রভাব ফেলে। এ জন্যই মুক্তির পথ চেনার জন্য, স্বাধীনতার পদ্ধতি জানার জন্য উদাহরণত আলজেরিয়ার—যারা দীর্ঘ ১৩০ বছর সংগ্রাম করে, এক মিলিয়নেরও বেশি শহিদের নজরানা পেশ করে ফরাসিদের দখলদারি থেকে মুক্ত হয়েছিল—স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস পাঠ করা প্রয়োজন। তেমনিভাবে লিবিয়া, মিশর ও সিরিয়া ইত্যাদি মুসলিম রাষ্ট্রের সফল স্বাধীনতা সংগ্রামগুলোর ইতিহাস পাঠ করা উচিত। শুধু এতটুকুতেই থেমে গেলে চলবে না। বরং মানব সভ্যতার যেকোনো স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস পাঠ করা আমাদের উচিত। এমনকি অমুসলিমদের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসও পাঠ করতে হবে। উদাহরণত প্রায় চার মিলিয়ন ভিয়েতনামি লোকের প্রাণ বিসর্জন দেওয়ার পর আমেরিকার দখলদারি থেকে ভিয়েতনামের জনগণের মুক্তি পাওয়ার অভিজ্ঞতা। তেমনিভাবে আমেরিকার কাছ থেকে কোরিয়ার স্বাধীনতা, জার্মানির কাছ থেকে ফ্রান্সের স্বাধীনতা, জাপানের কাছ থেকে চীনের স্বাধীনতা ইত্যাদি রাষ্ট্রের স্বাধীনতার অভিজ্ঞতা পাঠ করাও উচিত, যাতে মুসলিমরা স্বাধীনতার পথ ও পদ্ধতি চিনতে পারে এবং সংকট থেকে বের হওয়ার উপায় সম্পর্কে জানতে পারে।

স্বাধীনতা সংগ্রামের এই অভিজ্ঞতাগুলো পাঠ করাটা মুসলিমদেরকে কেবল ভূখণ্ড মুক্ত করার পথ ও পদ্ধতি জানার ক্ষেত্রেই উপকৃত করবে না; বরং একইসঙ্গে অমুসলিমদের কাছে যৌক্তিক প্রমাণও পেশ করবে; যখন আমরা তাদের সাথে ফিলিস্তিন ভূমিতে

জিহাদের ব্যাপারে কথাবার্তা বলব, তখন পুরো বিশ্ব দেখবে, যাদেরকে টেরোরিস্ট বা সন্ত্রাসী বলে অপবাদ দেওয়া হচ্ছে, তারা আসলে বীর-বাহাদুর—ইতিপূর্বে স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামকারী সকল জাতির পরিভাষা অনুযায়ী তাঁদেরকে বীর বলে আখ্যায়িত করা হবে। এ ক্ষেত্রে ফরাসিদেরকে আপনার এটুকু বলাই যথেষ্ট যে, জার্মানরা যখন ফ্রান্স দখল করে নিয়েছিল, তখন জার্মানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া ফরাসিদের ব্যাপারে আপনাদের কী অভিমত? আপনারা কী তাদেরকে টেরোরিস্ট হিসেবে গণ্য করেন, যারা জার্মানদেরকে হত্যা করতে তাদের ওপর আক্রমণ চালিয়েছে? নাকি তাদেরকে বীর হিসেবে গণ্য করেন, যারা নিজ দেশের অধিকার রক্ষা করতে সংগ্রাম করেছে এবং অবশিষ্ট জনগণকে সুখী করতে নিজেদের প্রাণ বিলিয়ে দিয়েছে?

বন্ধুরা, আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ বিরতি—আমরা আমাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে কীভাবে জয়লাভ করব?

উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, তোমরা তোমাদের শত্রুর বিরুদ্ধে প্রস্তুতি ও সাজ-সরঞ্জামের দ্বারা জয়লাভ করতে পারবে না। তোমরা তাদের ওপর জয়লাভ করবে তোমাদের রবের প্রতি তোমাদের আনুগত্য এবং তোমাদের শত্রুদের অবাধ্যতার ফলে। যদি তোমরা আল্লাহর অবাধ্যতার ক্ষেত্রে শত্রুদের সমান হয়ে যাও, তবে তারা প্রস্তুতি ও সাজ-সরঞ্জামের শক্তিতে তোমাদের ওপর বিজয়ী হয়ে যাবে।

আমরা মুসলিম, আমরা আল্লাহর সাহায্য ছাড়া জয়লাভ করতে পারব না। ইতিহাসে যে মুসলিম নেতাই ইসলাম ছাড়া সম্মানিত হওয়ার চেষ্টা করেছে, আল্লাহ তাকে লাঞ্ছিত করেছেন। যে মুসলিম বাহিনীই ইসলাম ছাড়া জয়লাভের চেষ্টা করেছে, আল্লাহ তাআলা তাদেরকে পরাজিত করেছেন। আর পুরোপুরি এর বিপরীত—যে মুসলিম নেতা ও বাহিনী ইসলামকে আঁকড়ে ধরেছে, তারা বিজয়ী হয়েছে, যদিও তারা স্বল্পসংখ্যক ছিল, দুর্বল ছিল।

কিছু শরয়ি নীতিমালা—

> ‘কত ছোট দল আল্লাহর হুকুমে বড় দলকে পরাজিত করেছে! আর আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।’ [সুরা বাকারা : ২৪৯]

> ‘যদি তোমরা আল্লাহকে সাহায্য করো, তবে আল্লাহও তোমাদেরকে সাহায্য করবেন এবং তোমাদের পা সুদৃঢ় (অবিচল) করে দেবেন।’ [সুরা মুহাম্মাদ : ৭]

> ‘যদি আল্লাহ তোমাদেরকে সাহায্য করেন, তবে তোমাদের ওপর বিজয়ী কেউ নেই। আর যদি তিনি তোমাদেরকে লাঞ্ছিত করেন, তবে কে এমন আছে যে, তোমাদেরকে এর পরে সাহায্য করবে?’ [সুরা আলে ইমরান : ১৬০]

এর পরে তোমাদের কে সাহায্য করবে? আমেরিকা? রাশিয়া? ইউরোপীয় ইউনিয়ন? জাতিসংঘ? আন্তর্জাতিক আইন? কে? কেউ না! কেউ তোমাদের সাহায্য করবে না।

> 'অতএব তোমরা আল্লাহর দিকে ধাবিত হও। আমি তো তাঁর পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য এক স্পষ্ট সতর্ককারী।' [সুরা জারিয়াত : ৫০]

বিষয়টাকে আল্লাহর শরিয়তের আলোকে বুঝলে এ ব্যাপারে দৃষ্টি নিবদ্ধ হবে যে, পুরো ফিলিস্তিন ইসলামি। আর ফিলিস্তিনের সামান্য পরিমাণ ভূমির ব্যাপারে শিথিলতা যেন দ্বীনের ব্যাপারে শিথিলতা করা।

এ কথা বলার সুযোগ নেই যে, পশ্চিম তীর ও গাজা হচ্ছে একটা ধাপ। (এ দুটো মুক্ত হয়ে গেলে) পরে পর্যায়ক্রমে পুরো ফিলিস্তিন মুক্ত হবে। কখনোই না! ফিলিস্তিন ভূমির ৭৮%-এর ওপর শত্রুর কর্তৃত্ব স্বীকার করে নেওয়ার দ্বারা আপনি তাদের শক্তি বৃদ্ধি করবেন আর আপনার দুর্বলতা বেড়ে যাবে। শত্রু দিনদিন তার গ্রাসের পরিধি বাড়াতে থাকবে আর আপনি শুধু জায়গা ছাড়তে থাকবেন... বন্ধুরা, অধিকার দেওয়া হয় না (বরং তা ছিনিয়ে নিতে হয়)।

তা ছাড়া আমরা ইহুদি ও তাদের সমর্থক-পৃষ্ঠপোষকদের সাথে লেনদেন করেছি, একত্রে কাজ করেছি এবং তাদের বিশ্বাসঘাতকতা, খিয়ানত, ধোঁকা ও প্রতারণার পদ্ধতিগুলোর সাথে পরিচিত হয়েছি। যখনই আমরা এক পা পিছু হটব, অমনি সেখানে ইহুদিরা তাদের পা রেখে দেবে।

- ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে জাতিসংঘ সম্পূর্ণ অন্যায়ভাবে ফিলিস্তিনের ৫৬% ভূমি ইহুদিদেরকে বণ্টন করে দেয়। এটা করেছিল ১৮১ নম্বর প্রস্তাব নামক বণ্টনের অন্যায়-অন্যায্য সিদ্ধান্তের মাধ্যমে। এই সিদ্ধান্তের ফলে আরবরা ক্রুদ্ধ, উত্তেজিত হয়। কিন্তু... হায় আল্লাহ! তারা কোনো প্রতিবাদ-প্রতিরোধ করেনি!!

- ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দে ইহুদিরা ৭৮% ভূমি জবরদখল করে নেয়। অর্থাৎ, জাতিসংঘ তাদেরকে যতটুকু ভাগ করে দিয়েছিল, তারা এরচেয়েও ২২% ভূমি বেশি দখল করে। এবারও আরবরা ক্রুদ্ধ, উত্তেজিত হয়। কিন্তু... হায় আল্লাহ! এবারও তারা কোনো প্রতিবাদ-প্রতিরোধ করেনি!! তবে তারা বলতে শুরু করে, হায়! যদি আমরা জাতিসংঘের বণ্টন করে দেওয়া সীমানা পর্যন্তই ফিরে যেতে পারতাম! কিন্তু ইহুদিরা (সেসব অঞ্চলেও) তাদের পা রেখে দিয়েছে।

- ১৯৬৭ খ্রিষ্টাব্দের ৫ই জুন পশ্চিম তীর ও গাজা দখলের শিকার হয়। আরবরা ক্রুদ্ধ, উত্তেজিত হয়। তারা বলে, আমরা ১৯৬৭ খ্রিষ্টাব্দের ৪ই জুনের সীমানা ফেরত চাচ্ছি। আর ৭৮% ভূমির ওপর তোমাদের দখলদারি মেনে নিচ্ছি! লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ!

- বর্তমানে তারা ইসরায়েলকে ২০০০ খ্রিষ্টাব্দের ২৭শে সেপ্টেম্বরের সীমানা তথা ইন্তিফাদার আগের সীমানায় ফিরে যাওয়ার দাবি জানাচ্ছে। এভাবেই চলছে... শেষপর্যন্ত আমরা কী করব?! মনে হয়, আমরা আর কোনো প্রতিবাদ-প্রতিরোধ করব না!

সুতরাং কোনো ইহুদিকেই বাস্তবতা ঘোলাটে করার সুযোগ দেবেন না।

দখলদারির মধ্য দিয়ে যত দিনই অতিবাহিত হোক না কেন—ফিলিস্তিন পুরোটাই ইসলামি।

এ কারণেই আপনার জেরুসালেমের জন্য আমরা ফিলিস্তিন মুক্ত করব বলাটাও বিপজ্জনক। এমন বক্তব্য স্পষ্টতই ফিলিস্তিনের মুক্তির ব্যাপারটাকে বিভক্ত করে ফেলবে।

ইহুদিরা অচিরেই জেরুসালেমের মর্যাদাকে খুব বড় করে তুলে ধরবে এবং তা ধরে রাখবে। ফলে মুসলিমরা জেরুসালেমের ব্যাপারে ব্যস্ত হয়ে পড়বে এবং বাকি ভূখণ্ডের কথা ভুলে যাবে। সে সময় আপনি সেসব লোকের কথা শুনতে পাবেন, যারা বলবে, আমরা পশ্চিম তীর ও গাজায় একটি ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র চাই, যার রাজধানী হবে জেরুসালেম!

পরিশেষে ইহুদিরা এসে আপনাকে বলবে, আমরা তোমার জন্য অভূতপূর্ব ছাড় দিচ্ছি—জেরুসালেম নিয়ে নাও আর ৭৮% ভূমি ছেড়ে দাও। আপনি তা মেনে নেবেন আর বিজয়ের গৌরব অনুভব করবেন!!

এরপর আসবে নতুন এক ধাপ। যখন তারা মুসলিমদের মধ্যে খুব বেশি দুর্বলতা দেখতে পাবে, তখন বলবে, তোমরা পুরো জেরুসালেম নিয়ে নিয়ো না; তোমরা পূর্ব জেরুসালেম নিয়ে নাও আর পশ্চিম জেরুসালেম আমাদের জন্য রেখে যাও! এটাই ন্যায়পরায়ণতা! তখন অনেক আরব নির্বোধের মতো মুচকি হেসে বলবে আহা, এটাই সঠিক! আল্লাহর কসম, তোমাদের কাছে ন্যায়বিচার পাওয়া যায়! তবে পূর্ব জেরুসালেম কিন্তু ছাড়া যাবে না! সুবহানাল্লাহ!

আমার মনে আছে, আরবের বড় একটা পত্রিকার প্রধান শিরোনামে পড়েছিলাম, 'পূর্ব জেরুসালেম ছাড়া যাবে না!'[১৭] এই শিরোনাম স্পষ্টভাবে বুঝাচ্ছে যে, (শুধু পূর্ব জেরুসালেম রেখে) পশ্চিম জেরুসালেম, এমনকি পুরো ফিলিস্তিন ইহুদিদের হাতে ছেড়ে দেওয়া যাবে! এমনকি ১৯৯৩ খ্রিষ্টাব্দে সংঘটিত অসলো চুক্তির কোনো কোনো

[১৭] আশ-শারকুল আওসাতিদ দাওলিয়্যাহ : ৭৯৩৩তম সংখ্যা, ১৬ই জুমাদাল উলা ১৪২১ হিজরি, ১৭ই আগস্ট ২০০০ খ্রিষ্টাব্দ।

ধারায় তো স্পষ্টভাবে লিখে দেওয়া হয়েছে যে, জেরুসালেমের পূর্বাঞ্চলে কিছু গ্রাম প্রতিষ্ঠা করা হবে, যেগুলোর নাম দেওয়া হবে 'আল-কুদস'। এদিকে মূল আল-কুদস শহরটা ইহুদিদের হাতেই রয়ে যাবে। এর নাম দেওয়া হবে জেরুসালেম![১৮]

এ জন্যই সাবধান! সতর্ক থাকুন! ফিলিস্তিনের জন্য আপনার প্রতিরোধ-সংগ্রাম যেন জেরুসালেমের স্লোগানের আওতায় না হয়; এই সংগ্রামকে সর্বদা ফিলিস্তিনের স্লোগানের আওতায় রাখুন। বলবেন, ফিলিস্তিন ইসলামি; এটা বলবেন না যে, জেরুসালেম ইসলামি। বলবেন, ফিলিস্তিন আমাদের; এটা বলবেন না যে, জেরুসালেম আমাদের। বলবেন, ফিলিস্তিন ছাড়া যাবে না; এটা বলবেন না যে, জেরুসালেম ছাড়া যাবে না। এভাবেই (সর্বক্ষেত্রে জেরুসালেমের কথা না বলে ফিলিস্তিনের কথা বলবেন।)

পূর্বোক্ত কথার চেয়েও আপনার এই কথাটা বেশি বিপজ্জনক যে, আমরা মসজিদে আকসার জন্য ফিলিস্তিন মুক্ত করব!

কারণ, দীর্ঘ বাকবিতণ্ডার পর ইহুদিরা এসে আপনাকে বলবে, তাহলে মসজিদে আকসা নিয়ে নাও, ফিলিস্তিন ছেড়ে দাও!

আরেক ধাপে এসে তারা বলবে, শুধু একটি দেয়াল ছাড়া মসজিদে আকসার বাকি অংশ নিয়ে নাও। তারা দলিল দেবে যে, এই দেয়ালটা কান্নার দেয়াল এবং সুলাইমান আলাইহিস সালামের হাইকালের অবশিষ্টাংশ।

আরেক ধাপে এসে তারা সুলাইমান আলাইহিস সালামের হাইকালের খোঁজে মসজিদে আকসার নিচে খনন করতে থাকবে।

এই সবকিছু আমরা নিজ চোখে প্রত্যক্ষ করছি।

মসজিদে আকসা বেশি দামি, নাকি মুসলিমদের রক্ত?

ইমাম ইবনে মাজাহ রাহিমাহুল্লাহ আবদুল্লাহ বিন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কাবাঘর তাওয়াফ করতে দেখলাম, তিনি বলছিলেন, কত উত্তম তুমি হে কাবা! আকর্ষণীয় তোমার খোশবু, কত মহান তুমি! কত উচ্চ মর্যাদা তোমার। সেই সত্তার শপথ, যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ! আল্লাহর কাছে মুমিন ব্যক্তির জান-মাল ও ইজ্জতের মর্যাদা তোমার চেয়ে অনেক বেশি। আর আমরা মুমিন ব্যক্তি সম্পর্কে সুধারণাই পোষণ করি।[১৯]

---

[১৮] আহমাদ সবরি দাবশ, আল-ওয়াজউল কানুনি লিল-কুদস ফি জাওয়ি ইত্তিফাকাতি উসলু ওয়ামা তালাহা মিন ইত্তিফাকাত : আল-কুদস পত্রিকা : দশম সংখ্যা, অক্টোবর ১৯৯৯ খ্রিষ্টাব্দ।

[১৯] *সুনানু ইবনু মাজাহ* : ৩৯৩২।

এ জন্যই এরিয়েল শ্যারনের মসজিদে আকসা পরিদর্শনকে কেন্দ্র করে মুসলিম উম্মাহর জ্বলে ওঠা, বিদ্রোহী হয়ে ওঠাটা ছিল অদ্ভুত একটা বিষয়; যদিও এতে সন্দেহ নেই যে, শ্যারনের মসজিদে আকসা পরিদর্শন ছিল একটা জঘন্য বিষয়। অথচ সবরা ও শাতিলায় ম্যারোনিটস খ্রিষ্টান ও ইহুদিদের হাতে তিন হাজার ফিলিস্তিনি মুসলিম নিহত হওয়া সত্ত্বেও মুসলিমরা এভাবে বা এরচেয়ে বেশি জ্বলে ওঠেনি।

আমাদেরকে অবশ্যই অগ্রাধিকার বিন্যস্ত করতে হবে।

ইসলাম কোনো জটিল-দুর্বোধ্য ধর্ম নয়। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে আলোকিত দ্বীনের ওপর রেখে গিয়েছেন, যার রাতও দিনের মতোই উজ্জ্বল-আলোকিত। কেবল ধ্বংসপ্রাপ্ত ছাড়া কেউ এই দ্বীন থেকে বিচ্যুত হবে না।[২০]

প্রথম অগ্রাধিকার: পুরো ফিলিস্তিন ভূখণ্ড। কারণ, এই ভূখণ্ড ইসলামি। এতে শিথিলতা করার মানে হচ্ছে দ্বীনের মধ্যে শিথিলতা করা। তাই দ্বীনের জন্য প্রয়োজনে সবকিছু ত্যাগ করতে হবে।

দ্বিতীয় অগ্রাধিকার: রক্ত। মুসলিমদের রক্তের অনেক মর্যাদা রয়েছে। তবে দ্বীন রক্ষার জন্য প্রয়োজনে রক্ত খরচ করা যাবে।

তৃতীয় অগ্রাধিকার: পবিত্র স্থান, ভবন ঘরবাড়ি ও ধনসম্পদ। এই সবগুলোই গুরুত্বপূর্ণ। তবে এগুলোর জন্য কখনোই ভূমি ত্যাগ করা যাবে না।

আরেকটা পয়েন্ট: যেসব ইসলামি ভূখণ্ডে হারাম শরিফ নেই, কিবলা নেই, কাবা নেই, মসজিদে আকসাও নেই, সেসব ভূখণ্ড কি মুসলিমরা ছেড়ে দেবে? চেচনিয়া, কাশ্মীর, বসনিয়া, ইরাক বা সুদানকে ছিনিয়ে আনার জন্য আমাদের শিরায় শিরায় কি রক্ত টগবগ করে ওঠে না?

প্রিয় ভাই, বিষয়গুলোকে হালকা করে দেখবেন না। ইহুদিদের বিভক্তি থেকে বেঁচে থাকুন।

লক্ষ্য স্থির করুন। ইনশাআল্লাহ আপনার লক্ষ্যে পৌঁছে যাবেন।

পূর্বোক্ত সবগুলোর চেয়ে আপনার এ কথা আরও বেশি বিপজ্জনক যে, ফিলিস্তিন আরব রাষ্ট্র হওয়ায় আমরা তা মুক্ত করব!

যদি আমরা এমনটা করি, তবে বিজয়ের মাধ্যমগুলো একেবারে হারিয়ে যাবে।

তখন আমরা আল্লাহ তাআলার কিতাব, তাঁর নিয়ম ও তাঁর শরিয়তকে আঁকড়ে ধরার পরিবর্তে এমন একটা বিষয়কে আঁকড়ে ধরব, যেটাকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

[২০] এই কথাগুলো *সুনানে ইবনে মাজাহর* ৪৩ নম্বর হাদিসে রয়েছে।—অনুবাদক।